দীপান্বিতা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট, কলিকাতা-১২

প্রকাশ কাল আশ্বিন ১৩৬৩
প্রকাশক : মলয়েন্দ্র কুমার সেন
ক্যালকাটা পাবলিশার্স
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট,
কলিকাতা।

মুদ্রাকর : শ্রীইন্দ্রজিত পোদ্দার
শ্রীগোপাল প্রেস
১২১, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিট,
কলিকাতা।

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : দি নিউ প্রাইমা প্রেস
প্রচ্ছদ শিল্পী : সুবোধ দাশগুপ্ত

॥ দাম আড়াই টাকা ॥

শ্রীমতী সান্ত্বনা বিশ্বাস

কল্যাণীয়াসু

—এই লেখকের—

চে না ম হ ল

দীপান্বিতা ॥ নরেন্দ্রনাথ মিত্র

স্বাধিকার

কলেজে বেরোবার আগে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বীথিকা আলতো করে মুখে পাউডারের পাফ বুলোচ্ছিল। রান্নাঘর থেকে আশালতা পা টিপে টিপে শোবার ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালেন, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ মেয়ের প্রসাধন দেখলেন, রোজ দেখছেন, কতদিন ধরে দেখছেন, দেখে দেখে তবু যেন সাধ মেটেনা। সাজসজ্জার দিক থেকে মায়ের মতই হয়েছে মেয়ে। ভারি ওজনের গয়নাগাঁটি পছন্দ করেনা। চড়া রঙের শাড়ি আর রাঙা ধরনের মেক-আপ মোটেই মনঃপূত নয় বীথিকার। সাজসজ্জা সম্বন্ধে বরং একটু উদাসীন অগোছাল ভাবই আছে। তাই প্রসাধনে বেশি সময় লাগেনা তার। কিন্তু আশালতার আজকাল মাঝে মাঝে দেখতে ইচ্ছে করে—মেয়ে আর একটু বেশি করে, বেশিক্ষণ ধরে সাজুক। রুজ আর লিপস্টিক না মাখে না-ই মাখলো, কিন্তু শাড়ি-ব্লাউসের রং আরও একটু গাঢ় হোক, খোঁপা বাঁধার ছাঁদে নতুনত্ব আসুক। মার আংটি, চুড়, বালার নিত্য নতুন প্যাটার্ন সম্বন্ধে খুকু কিছু আগ্রহ ঔৎসুক্য দেখাক। শত হলেও মেয়ে তো, আর এই বয়সের মেয়ে, ওর পক্ষে সাজসজ্জাটাই স্বাভাবিক। অবশ্য ওকে না সাজলেও সুন্দর দেখায়। কিন্তু সাজলে যে আরো সুন্দর দেখায় সে কথাও তো মিছে নয়।

হঠাৎ মেয়ের কানের দিকে চোখ পড়তেই আশালতা থমকে গেলেন। তারপর একটু তিরস্কারের সুরে বললেন, ওকি খুকু, সেই লাল পাথর বসানো ফুল দুটি খুলে রেখেছিস যে। না না, ওটা তোমাকে আজ পরতেই হবে। অনিমাদি অত সাধ করে আগ্রা থেকে তোমার জন্যে কিনে এনেছেন।

বীথিকা এবার মুখ ফিরিয়ে তাকাল, এনেছেন বলে সব সময়

যে পরতে হবে তার তো কোন মানে নেই মা। আমি তো আর বিয়ে বাড়িতে যাচ্ছি নে।

আশালতা এবার হাসলেন, তা জানি, কলেজেই যাচ্ছ কিন্তু তুমি তো এখন আর কলেজের ছাত্রী নও—প্রফেসর, এখন একটু সাজ গোছ ক'রে বেরোলে কেউ নিন্দে করবে না। আর করে যদি, করুক। আমি কারো কোন নিন্দের ভয় করি নে।

মেয়ের আপত্তি অগ্রাহ্য করে আশালতা দেরাজ খুলে নিজেই ফুল জোড়া বার করলেন। তারপর জোর করে মেয়ের কানে পরিয়ে দিয়ে ছাড়লেন। তেইশ চব্বিশ বছরের তরুণী মেয়ে নয় যেন বীথিকা, যেন চৌদ্দ বছরের স্কুলের ছাত্রী। প্রতিবাদ করে যখন কোন ফল হয় না, বীথিকা অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর হাল ছেড়ে দিয়ে বলল 'কর তোমার যা ইচ্ছে।'

আশালতা বললেন, করবোই তো। তুমি প্রফেসরই হও আর যা-ই হও আমার কাছে যে খুকু সেই খুকু।

গভীর স্নেহে কণ্ঠ স্নিগ্ধ হয়ে এল আশালতার। পরিতৃপ্ত আত্ম-প্রসাদে এই প্রৌঢ় বয়সেও মুখখানা কোমল হয়ে উঠল।

সেই মুখের দিকে একটুকাল চেয়ে থেকে বীথিকা বলল, তুমি বুঝি তাঁই ভাব মা?

আশালতা বললেন, এর মধ্যে ভাবাভাবির কি আছে?

বীথিকা বলল, তা ঠিক। তোমাব মধ্যে দ্বিধা সংকোচ বলে কোন বস্তু নেই। বেশি চিন্তা ভাবনাও তোমাকে করতে হলে সোজাসুজিই ক'রে ফেলতে পার।

মেয়ের মুখে আত্মস্বভাবের বিশ্লেষণ শুনে আশালতা হাসলেন, বললেন, তাছাড়া কি, আমি কি তোদের মত? তারপর কি মনে পড়ে যাওয়ায় জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা খুকু, তোর বুঝি ভয় ভয় করে?

বীথিকা বলল, তোমাকে ? ভয় ভয় কি বলছ মা, তোমাকে রীতিমত ভয় করি।

আশালতা বললে, আমার কথা বলছিনে। আমাকে ভয় না করে তুই যাবি কোথায় ? তোর বাপ পর্যন্ত ভয় করে চলে। আমি তোর কলেজের কথা জিজ্ঞেস করছি। যে কলেজে পড়েছিস সেই কলেজেই যে ফের মাস্টারি করতে যাস, পারিস তো করতে ? সেই সব প্রফেসরদের সঙ্গে মিলে মিশে সমানে সমানে কাজ করতে পারিস তো ?

বীথিকা বলল, কেন পারব না। আমার প্রফেসররা তোমার মত নন মা। তাঁবা আমাকে খুকি ভাবেন না। বরং খুব স্বাধীনতা দেন।

আশালতা কৃত্রিম ক্রোধের ভঙ্গিতে বললেন, নেমকহারাম মেয়ে। আমি বুঝি তোমাকে কম স্বাধীনতা দিয়েছি ? আমি স্বাধীনতা না দিলে এতদিনে তোমার আমারই দশা হতো। কলেজ তো ভাল, স্কুলেব গণ্ডিও পার হতে পারতিস নে। কোন যুগে বিয়ে হয়ে যেত। এত দিনে দিব্যি গিন্নীবান্নি হয়ে যেতিস। তারপর হাতা বেড়ি নিয়ে রাতদিন আমাবই মত রান্নাঘবে বন্দী হয়ে থাকতিস।

বীথিকা বলল তা জানি মা। আমি যা হয়েছি তোমার জন্যেই হয়েছি। এবার যাই। কলেজেব বেলা হয়ে গেল।

ছোট্ট গড়গড়াটি টানতে টানতে সুধাময়বাবু পাশের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার ওকে ছেড়ে দাও। কলেজে যদি যেতে হয় চলে যাক। মেয়ের সঙ্গে বচসা করবার সময় পরেও পাবে। ওদিকে দেখ গিয়ে তোমার রান্নাবান্না বোধ হয় সব পুড়ে গেল।'

আশালতা বিরক্ত হয়ে বললেন, যাবে না গো যাবে না। চিরকাল তো আমাকে কেবল রন্নাঘর দেখিয়েই এলে। ভয় নেই, তোমার

জিনিসপত্তরের কিছুই লোকসান হবে না। রাধাকে বসিয়ে রেখে এসেছি সেখানে।

রাধা বাড়ির রাঁধুনি। এর আগে ঠিকে ঝি ছাড়া স্থায়ীভাবে কাউকে রাখা হয়নি। কিন্তু চাকরি নেওয়ার পর বীথিকা জোর করে রাত দিনের লোক রেখেছে। নইলে মার কষ্ট হয়। কিন্তু সুধাময়ের ইচ্ছা রান্নাঘরের কাজটা বীথির মা-ই করুক। বাইরের লোকের রান্না তার পছন্দ হয় না।

স্ত্রীর কথায় সুধাময় চটলেন না। হেসে বললেন, তুমি না হয় একজনকে বদলী দিয়ে এসেছ। খুকু তো আর তা দিয়ে আসেনি। ওকে ক্লাসে না দেখলে ওর ছাত্রীরা যে গোলমাল করবে।

আশালতা বললেন, তা করুক। তুমি একা যে শোরগোল করতে পার ওর এক-কলেজ ছাত্রীও তা পারে না।

স্বামীর সঙ্গে আর তর্ক না করে মেয়ের পিছনে পিছনে সদর দরজা অবধি এগিয়ে গেলেন আশালতা, বললেন, ও খুকু, শোন।

বীথিকা এবার একটু বিরক্ত হয়ে পিছনে ফিরে তাকাল, আবার কি বলছ মা।

আশালতা বললেন, আমার ইচ্ছে ছিল না তুই আজ কলেজে যাস। না গেলেই যখন চলবে না, তাড়াতাড়ি কিন্তু ফিরে আসিস।

বীথিকা বলল, কেন?

আশালতা মৃদু হাসলেন, আহাহা তবু বলে কেন, যেন কিছু জানেন না। অরুণরা আজ আসবে যে। অরুণ, তার বাবা মা আর অরুণের ছোট বোন এনাক্ষীকে আজ চায়ে বলেছি, মনে নেই তোর? আজ কিন্তু ওরা তোর কাছ থেকে পাকা কথা নিয়ে যাবে। পণ্ডিত-মশাইকে দিয়ে পঞ্জিকা দেখিয়ে দিন আমি মোটামুটি ঠিক করে রেখেছি। এখন অতুলবাবুর কোন খুঁতখুঁতি না থাকলেই হয়। অমনিতে বিলাত ফেরত ডাক্তার হলে কি হবে, পাঁজি পুঁথির বেলায়

তোমার বাবার চেয়েও এক কাঠি ওপরে। সকাল সকাল চলে আসিস কিন্তু। খাবার টাবার তোমাকেও এসে সঙ্গে সঙ্গে করতে হবে বাপু। আমি একা সব করতে পারবনা।

বীথিকা বলল, আচ্ছা মা তাড়াতাড়িই আসব।

ফিরে আসবার পর সুধাময় বললেন, ওকি, এত তাড়াতাড়িই চলে এলে। যা একখানা মেয়ে-সোহাগী হয়েছ। আমি ভাবলাম, একেবারে বুঝি কলেজ পর্যন্তই খুকুকে এগিয়ে দিয়ে আসবে। যা দেখছি—মেয়ের বিয়ে হয়ে গেলে তুমি বোধহয় বছরে এগার মাস জামাই বাড়িতেই কাটাবে।

আশালতা জবাব দিলেন, তা যদি কাটাই তোমার তো পোয়া বারো। রাতদিন কেবল তামাক খাবে, গল্প করবে আর দাবা খেলবে। আমাকে তোমার কোন কাজে লাগে ?

সুধাময় বললেন, বরং উল্টোটাই সত্যি। আমাকেই তোমার কোন কাজে লাগে না। রিটায়ার করবার পর থেকে আমি একেবারেই অকেজো হয়ে গেছি।

স্বামীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি না করে আশালতা রান্নাঘরে চলে এলেন। মাংসটা এবেলাই রেঁধে রাখতে হবে। চিংড়ির কাটলেট খেতে খুব ভালোবাসেন অতুলবাবু। সেগুলি ওঁরা এলে গরম গরমই ভেজে দেওয়া যাবে। তারপর পিঠে আর মিষ্টান্নর ব্যবস্থা।

রাধাকে ডেকে বললেন, অমন হাত পা কোলে করে বসে থাকলে চলবে না বাপু, যা করবার চটপট করে ফেল।

তারপর নিজেই মাংস কষতে বসলেন।

অতুলবাবু এলে আজ দিনক্ষণ একেবারে পাকাপাকি করে ফেলবেন আশালতা। আর দেরি করে লাভ কি, মায়া বাড়িয়ে কি ফল আর। পরের ঘরে মেয়েকে তো আর না পাঠিয়ে চলবে না। এই যখন রীতি সংসারের।

আজ নয়, দশ-এগার বছর আগে থেকেই খুকুর বিয়ের কথা হচ্ছিল। প্রথমে শুরু করেছিলেন ওর ঠাকুরদা ঠাকুরমা। নাত-জামাই দেখে যাবেন এই তাঁদের সাধ। সুধাময় নিমরাজী। এত অল্প বয়সে আজকাল অবশ্য কেউ মেয়ের বিয়ে দেয় না। কিন্তু বুড়ো বাপ-মায়ের কথা তিনি অমান্যই বা করেন কি করে। কিন্তু আশা-লতাই বেঁকে বসলেন, না, কিছুতেই না। এত কম বয়সে কিছুতেই আমি খুকুর বিয়ে দিতে দেবো না। বাবার কাছে মুখ ফুটে তুমি না বলতে পার, আমি বলব। এই বয়সে বিয়ে হয়ে গেলে জীবনে ওর কোন্ সাধ মিটবে? লেখা হবে না, পড়া হবে না। আজীবন আমার মত আকাট মূর্খ হয়ে থাকবে।

শুধু স্বামীকেই ধমকালেন না আশালতা, শ্বশুরের কাছে গিয়েও আবদার জানালেন। তেলের বাটি আর গামছা হাতে স্নানের তাগিদ দিতে এসে বললেন, খুকু কি বলছে জানেন বাবা?

কি বলছে?

আশালতা আধখানা ঘোমটার আড়াল থেকে স্নিগ্ধস্বরে বললেন, ও বলছে বাইরে থেকে ওর বরকে আর ধরে আনার দরকার নেই। ওর বর ঘরেই আছেন। আপনাকে ছাড়া ওর আর কাউকে পছন্দ নয়।

হাঁটু অবধি তেলধুতি পরে জলচৌকির ওপর বসে হরিমোহন গায়ে সরষের তেল মাখতে মাখতে বললেন, বুঝতে পেরেছি। শত হলেও উকিলের মেয়ে তো। তা হলই বা সে ছোট আদালতের উকিল। কথা কি করে বলতে হয় তা আমার বেয়াই মশাই মেয়েকে ভালো করেই শিখিয়ে দিয়েছেন। আচ্ছা, তোমার যখন ইচ্ছে নয়, এবছরটা থাক।

সে বছরটা বিয়ের উদ্যোগ স্থগিত রইল। কিন্তু পরের বছর থেকে আবার ছেলে দেখা, মেয়ে দেখানোর তোড়জোড় শুরু হল।

এবার আর মিষ্টি কথায় শ্বশুরের মন ভোলাতে পারলেন না আশালতা। পুত্রবধূর আপত্তি আছে শুনে, হরিমোহনবাবু রীতিমত চটে উঠলেন, তুমি বলছ কি বউমা, আমাদের এই ভটচার্য বংশে চোদ্দর ওদিকে আর মেয়ে পড়ে থাকে নি। তার আগেই তারা পার হয়ে গেছে।

আশালতা বললেন, কিন্তু বাবা, দিনকাল তো বদলে যাচ্ছে, আপনাদের সেই গৌরীদানের আমল আর নেই।

হরিমোহন চেঁচিয়ে উঠে বললেন, আমল আছে কি না আছে আমি বুঝব। আমি যতদিন বেঁচে আছি আমার কথামত সংসার চলবে। তা যদি না হয় সুধাময় যেন ছেলে বউ নিয়ে আলাদা বাড়িতে গিয়ে থাকে।

এরপর স্বামী এসে কৈফিয়ত চাইলেন, তুমি নাকি বাবার সঙ্গে ঝগড়া করেছ ?

আশালতা বললেন, হ্যাঁ করেছি। ওঁরা জোর করে আমার মেয়ের বিয়ে দিতে চান। কিন্তু আমি কিছুতেই তা দোব না। ওকে আমি কলেজে পড়াব। মেয়ে তো ওঁদের নয়, মেয়ে আমার। দরকার হয় ওঁরা যেন তোমাব আর একটা বিয়ে দেন, আমার মেয়ের বিয়ে নিয়ে যেন কথা বলতে না আসেন।

দিন কয়েক খুব ঝগড়াঝাঁটি চলল। তারপর কথা বন্ধ। তার-পরেও হরিমোহন যখন পাত্র পক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা চালাতে লাগলেন ওঁদের সবাইকে না জানিয়ে—দাদাকে খবর দিয়ে মেয়ে নিয়ে বরানগরে বাপের বাড়িতে পালিয়ে গেলেন আশালতা।

হরিমোহন রাগ করে বললেন, এই যাওয়াই শেষ যাওয়া। ও বউয়ের মুখ আর আমি দেখতে চাইনে, নাতনীর মুখও না। সুধার আমি ফের বিয়ে দোব।

সুধাময় অবশ্য দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে আর স্বীকৃত হলেন না। কিন্তু স্ত্রী আর মেয়ের সঙ্গে সাময়িকভাবে সম্পর্ক ত্যাগ করলেন।

মাস ছয়েক বাদে রোগশয্যায় হরিমোহনই অবশ্য নাতনীকে ডেকে পাঠালেন। পুত্রবধূর সঙ্গে তেমন করে কথা না বললেও নাতনীর সেবাশুশ্রূষা সাগ্রহেই গ্রহণ করতে লাগলেন। একদিন রসিকতা করে বললেন, ছোটগিন্নী, তোমাকে তো তোমার মা এই বুড়োর হাতে সম্প্রদান করে রেখেছে। কিন্তু যদি মরি, তুমি কি সাবিত্রীর মত যমের পিছনে পিছনে ছুটবে? নাকি বলবে, বুড়ো ঘুমোল বাড়ি জুড়োল।

খুকু ছলছল চোখে জবাব দিয়েছিল, না দাদু না। যমকে এ ঘরে আমি ঢুকতেই দোব না। তুমি আরো অনেকদিন বাঁচবে।

হরিমোহন পাশ ফিরে শুতে শুতে বলেছিলেন, না ভাই, বাঁচতে আর ইচ্ছে নেই। তোমাদের নতুন কালের সঙ্গে বনিবনাও হবে না।

খুকু জবাব দিয়েছিল, বনিবনা না-ইবা হল দাদু। না হয় রাতদিন আমরা ঝগড়া করেই কাটাব। তবু তোমাকে আমি মরে যেতে দোব না।

হরিমোহন হেসেছিলেন, মরতে আর দুঃখ নেই দিদি, তোমার কথার মধ্যেই অমৃত। দেবতাদের তো নাতি নাতনী হত না তাই তাঁরা নিজেরা অমর হবার বর চাইতেন।

নাতনীর অনুরোধেই আশালতাকে শেষপর্যন্ত ক্ষমা করেছিলেন হরিমোহন। মৃত্যুর আগে ডেকেছিলেন, কথা বলেছিলেন, সুখে থাকবার জন্যে আশীর্বাদ করেছিলেন।

কিন্তু শাশুড়ী সিন্ধুবালা ক্ষমা করেন নি। তিনি তারপর আরো চার বছর বেঁচেছিলেন। চার বছরের প্রতিটি দিন-রাত খোঁটা দিয়েছেন বউকে। শ্বশুরের মৃত্যুর জন্যে আশালতাকে দায়ী করেছেন। বলেছেন, মানুষটা মনের অশান্তির জন্যেই গেল। নাহলে আরো দু'চার বছর বেশি বেঁচে যেতে পারত। তার কি মরবার বয়স হয়েছিল? তার চেয়ে কত বুড়ো এই পাড়াতেই দিব্যি হেঁটে চলে আনন্দ ফুর্তি করে বেড়াচ্ছে।

খুকুর বিয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই তিনি বলতেন, আমি আর ওর মধ্যে নেই বাবা। ও মেয়ে ঘরে চিরকাল থুাইবুড়ো হয়েই থাকুক, আর পাড়ার পাঁচটা বকাটে ছোকরার সঙ্গে ফষ্টি-নষ্টিই করুক, আমি কথাটি বলব না।

আশ্চর্য, শাশুড়ীর সঙ্গে স্বামীও সুর মেলাতেন। তিনিও দোষ দিতেন আশালতার। বংশের রীতিনীতি লঙ্ঘন করে স্বেচ্ছামত চলেছে, মেয়েকে নিজের পছন্দ মত গড়ে তুলছে, তার জন্যে আশাকে গঞ্জনা দিতে ছাড়তেন না! বলতেন, মেয়েতো আমার নয়, শুধু তোমার।

আশালতা জবাব দিতেন, শুধু আমার? আমি কি ওকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনেছি?

সুধাময় বলতেন, কে জানে, কুড়িয়ে এনেছ না অন্য কিছু করে এনেছ। খুকুর ধারণা তার বাবা একজন অশিক্ষিত উজবুক সেকেলে গোঁড়া বামুন। আব তার মা একেবারে আধুনিকা। শিক্ষায় দীক্ষায় মাজা ঘষা, যাকে বলে ঝকঝকে তকতকে। এই বাগবাজারের কাণা গলিতে থেকেও অমন বালিগঞ্জের চালে চলা কি সোজা কথা?

সোজা তো নয়ই। আশালতা জানতেন, হাড়ে হাড়ে টের পেতেন—এই বৈদিক ব্রাহ্মণের বাড়িতে চলাচলের একটু অদল বদল কবা বড় শক্ত। তবু তিনি একেবারে ভোল বদলে ছাড়লেন, যে বাড়িতে মেয়েরা পর্দানশীন হয়ে থেকে চৌদ্দ বছর বয়সে শ্বশুর-ঘর করতে যেত আর বছব বছর ছেলে কোলে নিয়ে একবার করে ফিরে আসত বাপের বাড়িতে, সেই বাড়ির মেয়েকে তিনি স্কুলের চৌকাঠ পার করে কলেজে দিলেন। শুধু মেয়েদের সঙ্গেই নয়, আত্মীয়স্বজন, কি ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের কলেজে পড়া বিদ্বান বুদ্ধিমান ছেলেদের সঙ্গেও মেয়েকে মেলামেশার অনুমতি দিলেন, সুযোগ দিলেন। শুধু মেয়েদের সঙ্গে মিলে কোন লাভ হয়না। এ সমাজে মেয়েদের জানাশোনার গণ্ডি আর কতটুকু।

কিই বা তাদের বিত্তাবুদ্ধি শক্তি সামর্থ্য। আত্মবিশ্বাসের সুযোগ-সুবিধা তারা কতটুকুই বা পায়। তাই অল্প বয়স থেকেই সহপাঠী সমবয়সী পুরুষ বন্ধুদের সঙ্গে মেশা দরকার। তাতে মনের জড়তা দূর হয়, আরও বৃহত্তর পৃথিবীর সংস্পর্শে আসা যায়। সে পৃথিবী কর্মের পৃথিবী, জ্ঞানের পৃথিবী।

এই পুরুষ প্রশস্তিতে আশালতা অবশ্য গোড়াতে তেমন বিশ্বাস করতেন না। বিশ্বাস করিয়েছে তার রাঙাদা। আপন ভাই নয়, পিসতুতো ভাই। কিন্তু আপন ভাইদের চেয়েও আশালতার কাছে বেশি আপন প্রবোধ রায়। শিক্ষা সংস্কৃতি রীতি রুচিতে তাঁর সঙ্গে আশার যেমন মেলে আর কারো সঙ্গেই তেমন মেলে না। কৃতি পুরুষ প্রবোধ রায়। নিজের চেষ্টায় মানুষ হয়েছেন। এঞ্জিনিয়ার হিসেবে তাঁর যেমন দাম হয়েছে, তেমনি অর্থ। সুধাময়ের মত বাপ দাদার বাড়ির উত্তরাধিকারী হন নি, নিজের উপার্জিত টাকায় বাড়ি করেছেন লেক প্লেসে। বিয়ে করেছেন বি এ পাশ সুন্দরী মেয়েকে। তবু আশালতাকে এখনো ভালবাসেন প্রবোধ। রাঙা বউদির সঙ্গে তুলনা দিয়ে বলেন, বি এ, এম এ বুঝিনে। বিদ্যের চেয়ে যে বুদ্ধি বড়, তা তোমাকে দেখলে বোঝা যায় আশা। তোমাকে দেখে কে বলবে যে তুমি স্কুল-কলেজের ছায়া মাড়াও নি, ঘরের বাইরে পা বাড়াও নি। সত্যি, তুমি যা করেছ তার কাছে আমার নিজের বাড়ি-গাড়ি অতি তুচ্ছ।

আশালতা রাঙাদার প্রশংসায় উৎসাহ পেয়েছেন, প্রেরণা পেয়েছেন। আর মনে মনে সংকল্প করেছেন নিজে যা হ'তে পারেন নি, মেয়েকে তাই গড়ে তুলবেন। ও তো শুধু মেয়ে নয়, মানসী। নিজেরই এক অতৃপ্ত আকাঙ্খা। তাই নিজের বাপ-মার কাছ থেকে যে স্বাধীনতা পান নি, ওকে স্বেচ্ছায় সে স্বাধীনতা দিয়েছেন। স্কুল ছেড়ে কলেজ, কলেজ পেরিয়ে বিশ্ববিত্তালয়ে আশালতা নিজেই যেন

মেয়ের সঙ্গে সঙ্গে গেছেন। ও তো আলাদা নয়, ও নিজেরই আত্মা, দ্বিতীয় যৌবন। নিজের স্বপ্ন আর সাধের সার্থক প্রতিমূর্তি।

বীথিকা যখন কলেজের চাকরিটা পেল, তখন আর একবার স্বামীর সঙ্গে বিরোধ বেধেছিল আশালতার। সুধাময় বলেছিলেন, কেন, আমার রোজগারে কি কুলোচ্ছে না যে মেয়ের চাকরি করতে হবে ?

আশালতা বলেছিলেন, বিয়ের আগে করলই বা কিছুদিন। ইকনমিক্সে ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছে শুধু কি চুপ করে ঘরেব কোণে বসে থাকবার জন্যে ? চর্চা না থাকলে বিদ্যেয় যে মরচে পড়ে যাবে।

মনে মনে ভেবেছেন, নিজে তো কোনদিন চাকরি করতে পারবেন না, নিজের হাতে উপার্জ্জন কবাব কি যে সুখ তা তো নিজে কোনদিন অনুভব করতে পারবেন না, মেযে করুক। ও করলেই আশালতার করা হবে।

অরুণও বসে থাকার চেয়ে ওর কাজ কবাটা পছন্দ কবেছে। সে বলেছে, মাসীমা, আর্থিক দিক থেকে আমাদেব সংসাবে বীথির চাকরি করাব অবশ্য কোন দবকারই হবে না। আপনার আশীর্বাদে আমাব নিজের যা আয় আছে তাতেই চলবে। তবু আমি চাই বীথি শুধু ঘরকন্না না করে বাইবে কাজকর্মও করুক, যেভাবে পাবে সেবা করুক সমাজকে।

ঠিক যেন আশালতার মনের কথার প্রতিধ্বনি। চমৎকাব ছেলে, শুধু বিদ্বান নয়, রূপবান, স্বাস্থ্যবান। ইনকামট্যাক্স অফিসে ভাল চাকরি করে। পদ আব মাইনে দুয়েরই গুরুত্ব আছে। বাপ বিলাত ফেরত ডাক্তার। নাক কান আর গলার রোগে বিশেষজ্ঞ। চেম্বার আছে ধর্মতলায়। এখনো অবশ্য আলাদা বাড়ি করেন নি। কিন্তু জায়গা কিনে রেখেছেন ঢাকুরিয়ায়। সাদার্ন এভেনিয়ুতে যে ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে আছেন, অতি স্বচ্ছল অবস্থার লোক ছাড়া কেউ তার

ধারে কাছে ঘেঁষতে পারে না। অরুণরাও বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। একেবারে পালটি ঘর। এমন মিল সাধারণত চোখে পড়ে না। রাঙা বউদি সুরমা প্রায়ই বলেন, আশা, অরুণ তোমার মেয়ের জন্মেই জন্মেছে। যাকে বলে প্রজাপতির নির্বন্ধ।

আশালতা হেসে জবাব দেন, সে প্রজাপতিটি তুমি নিজে।

বউদি বলেন, না ভাই, আমি তোমার কাছে ফড়িং। প্রজাপতির রং তুমি বরং নিজেই মেখেছ। তোমাকে দেখে কে বলবে, তুমি বীথির মা, বড় বোন নও।

বাগবাজারে থেকেও বালিগঞ্জবাসী অরুণ চক্রবর্তীর যে নাগাল পেয়েছেন আশালতা তা এই রাঙাদা রাঙা-বউদিরই গুণে। ওরাই মধ্যস্থ হয়ে অরুণ আর বীথির ভাব করিয়ে দিয়েছেন, অবশ্য মাঝে মাঝে আশালতারও নিমন্ত্রণ হয়েছে সে সব পার্টিতে। গুরুজনের গুরুত্ব হ্রাস ক'রে আশা আর সুরমা এই দুটি তরুণ তরুণীর সঙ্গে সমবয়সীর মত মিশেছেন। সখীর মত হাসি ঠাট্টা গল্প করেছেন। নিজের তো ভালোবেসে বিয়ে হয়নি। বাবা ঘটক ডেকে সম্বন্ধ ঠিক করেছিলেন। তাতে পূর্বরাগ অনুরাগের কোন বালাই ছিলনা। মেয়ের বেলায় যে তার ব্যতিক্রম হতে যাচ্ছে তাতে খুশীই হয়েছেন আশালতা। এই তো তিনি চেয়েছেন। নিজে রাশি রাশি গল্প উপন্যাস পড়েছেন। কিন্তু চিরকাল পাঠিকাই থেকে গেছেন, নায়িকা হ'তে পারেননি। খুকু হোক সেই রম্য উপন্যাসের নায়িকা। তার মধ্যে দিয়েই আশালতা হবেন। বইয়ের নায়ক নায়িকার সঙ্গে আশালতা মিলিয়ে মিলিয়ে দেখেছেন অরুণ আর বীথিকাকে। লক্ষ্য করেছেন কি করে একজনের মনের রঙ আর একজনের মনে গিয়ে লাগে, একজনের গলার স্বর আর একজনের আনন্দ সিন্ধুতে কি করে তরঙ্গ তোলে, একজনের সামান্য ছোঁয়ায় আর একজন কি ভাবে রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে।

মাঝে মাঝে আপত্তি করেছেন সুধাময়, স্ত্রীকে সাবধান করে দিয়েছেন, মেয়েটাকে যে এতখানি ছেড়ে দিচ্ছ এর ফল কি ভাল হবে ? বিয়ের আগে এতটা মেশামিশি কি উচিত ? পাড়ার লোকে কত কি বলে।

আশালতা জবাব দিয়েছেন, বলুক। তোমার এ পাড়ার বলা-বলিতে আমার কিছু এসে যায় না।

সুধাময় বলেছেন, কিন্তু আমার যায়, আমি আমার পাড়া পড়শী নিয়ে বাস করি। অরুণ বিয়ে করবে কিনা শোন। যদি না করে অত মেলা মেশা করতে বারণ করে দিও।

কিন্তু আশালতা বারণ করেন নি। বরং রাঙাদা রাঙা বউদি যখন পুরী, ওয়ালটেয়ার, শিলং দার্জিলিং-এ বেড়াতে যাওয়ার সময় খুকুকে সঙ্গে নিয়েছেন, আর অরুণকে না ডাকতেও সে কোন না কোন অছিলা অজুহাতে গিয়ে হাজির হয়েছে তখন আশালতার চেয়ে বেশি খুশী কেউ হয়নি। শুধু মেয়েকেই পাঠান নি আশালতা। নিজেও দাদা বউদির সঙ্গে গেছেন দু'চার বার। লক্ষ্য করেছেন সমুদ্রে পর্বতে অরুণ-বীথিকার প্রণয় কাহিনীর পটভূমির পরিবর্তন। দুজনে গল্প করতে করতে কখন ওরা গুরুজনদের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, সমুদ্রের ধার দিয়ে আধা অন্ধকারে পাশাপাশি হেঁটেছে। আশালতা যেন দেখেও দেখেন নি। শুধু নীল সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গের দিকে চেয়ে রয়েছেন আর সেই ঢেউয়ের অবিরাম ওঠা পড়া নিজের বুকের মধ্যে অনুভব করেছেন, রক্তের মধ্যে দোলা লেগেছে প্রথম যৌবনের। পাহাড়ের চড়াই উতরাই ভাঙতে ভাঙতে কখন ওরা অদৃশ্য হয়ে গেছে; ঘণ্টার পর ঘণ্টা নিরালায় ঝরনার ধারে বসে গল্প করে কাটিয়েছে, আশালতা হিসাব নিতে যান নি।

শুধু দু'একদিন মেয়েকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, খুকু নিজের সম্মান বজায় রেখে চলিস, কখনও যেন মর্যাদা হারাসনে।

খুকু হেসে জবাব দিয়েছে, তোমার কোন ভয় নেই মা। আমার জন্যে তোমাকে অত ভাবতে হবে না।

আশালতা স্মিতমুখে ফের জিজ্ঞেস করেছেন, তবে কার জন্যে ভাবব? অরুণের জন্যে?

তাঁর মেয়ে যে সহজ লভ্যা নয় তা তিনি অরুণের কাছেই শুনেছেন। বয়সের তুলনায় বেশি গম্ভীর, বেশি রাশভারি মেয়ে বীথিকা। ওর মনের হদিস পাওয়া ভার। এ অভিযোগ তিনি অরুণের কাছেই অনেকবার শুনেছেন। মনে মনে ভেবেছেন এই তো ভাল। সহজে ধরা দিলে ছাড়া পেতেও দেরি হয় না। যে মেয়ে দূরত্ব বজায় রাখতে জানে না—কাছের মানুষের কাছে তাকে অনেক দুঃখ পেতে হয়। মন জানাজানির জন্যে ওরা বড় বেশি সময় নিয়েছে সে কথা ঠিক। প্রায় পাঁচ ছয় বছর! অবশ্য অরুণের বাড়ির দিক থেকেও বাধা ছিল। ওর বাবা মা আরও অবস্থাপন্ন অভিজাত শিক্ষিত পরিবারে ছেলের বিয়ে দিতে চেয়েছিলেন, এ কথা আশালতা যে বুঝতে পারেন নি তা নয়। কিন্তু অরুণের চাল চলন আচার আচরণও তো দুর্বোধ্য ছিল না। ওর বাবা মা যদি রাজী না হতেন অরুণ বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসতে দ্বিধা করত না। কিন্তু সবুরে মেওয়া ফলেছে, সেই অপ্রীতিকর চরম অবস্থার মধ্যে কাউকে যেতে হয় নি। ছেলের হৃদয়ের সঙ্গে শেষ পর্যন্ত সায় দিয়েছেন তার বাপ মা। জয় হয়েছে খুকুর। রাঙা বউদি বললেন, জয় হয়েছে খুকুর মা আশালতার।

রান্না ঘরের কাজ কর্ম সারতে সারতে বেলা একটা বেজে গেল। রাধা একটি অকর্মার হাঁড়ি। ওকে দিয়ে কিছু করানোর চেয়ে নিজের হাতে করলে অনেক কম সময় লাগে আশালতার। তাই করলেন। মাংস রাঁধলেন, চিংড়ির কাটলেট ভাজলেন, পিঠে আর মিষ্টান্ন তৈরী করলেন। ঘরে এসে দেখলেন অফিস থেকে অবসর নেওয়া স্বামী

অন্যদিনের মতই নাক ডেকে দিবা নিদ্রা দিচ্ছেন। সকালের খবরের কাগজখানি দিয়ে মুখ ঢাকা। আশ্চর্য, আজ মেয়ের বিয়ের পাকা কথা-বার্তা হবে সে সম্বন্ধে বাপের না আছে কোন উৎসাহ ঔৎসুক্য, না কোন চিন্তা ভাবনা। রাঙাদা ঠিকই বলেন, করেছিস কি আশা—বকে বকে, ধমকে ধমকে স্বামীটিকে একেবারে সাংখ্যের পুরুষ বানিয়ে ছেড়েছিস।

কথাটা মিথ্যে নয়। আশালতার আজকাল প্রায়ই মনে হয় এমন বাধ্য অনুগত স্বামীর চেয়ে প্রথম যৌবনের সেই খেয়ালী অত্যাচারী স্বামীই ভালো ছিল।

আজকের এই পারিবারিক উৎসব উপলক্ষে রাঙাদা রাঙা বউদিকেও অবশ্য বলেছেন আশালতা, তাঁরা এলেই এ বাড়ির স্তব্ধতা ভাঙবে, নিঃসঙ্গতা দূর হবে। উল্লাসে আনন্দে, কোলাহল কলবোলে ভরে উঠবে বাড়ি। তার আগে সুধাময় যতক্ষণ খুশি ঘুমিয়ে নিক।

স্নানের জন্যে তেলের শিশিটা তাক থেকে কেবল নামিয়ে নিয়েছেন, সদরে কড়া নাড়ার শব্দ হল। আশালতা বললেন, রাধা, দেখতো কে এল এই দুপুর বেলায়। রাধা দরজার খিল খুলে দিতে তে বলল, ওমা এ-যে দিদিমণি।

মেয়ের আসা পর্যন্ত সবুর সইল না। হাসিমুখে আশালতা বারান্দা পার হয়ে দোরের কাছ থেকে মেয়েকে এগিয়ে আনতে গেলেন। বললেন, কিরে খুকু, তোর না সাড়ে তিনটে পর্যন্ত ক্লাস ছিল? আমি এই জন্যেই বলেছিলাম আজ তোর কলেজে গিয়ে কাজ নেই। মন দিয়ে ক্লাস নিতে পারবি নে। কি পড়াতে কি পড়াবি, আর ছাত্রীরা হাসবে। এত তাড়াতাড়ি এলি কি করে? পালিয়ে এলি না ছুটি নিয়ে এলি?

মায়ের এত উল্লাস এত উৎসাহ ভরা কথার জবাবে বীথিকা সংক্ষেপে বলল, আজ শেষপর্যন্ত কলেজে যাইনি মা।

আশালতা বললেন কলেজে যাস নি। তবে এতক্ষণ কোথায়

ছিলি ? এই রোদের মধ্যে কোথায় টো টো করে বেড়ালি ? যা ইচ্ছে তাই কর। শেষে একটা অসুখ বিসুখ হয়ে পড়লে আমি কিন্তু পারব না বাপু। কোথায় গিয়েছিলি ?

বীথিকা বলল, পার্ল রোডে।

আশালতা ভ্রূ কুঁচকে বললেন, পার্ল রোডে ? যেখানে সেই আর্টিস্ট ছোড়াটি থাকে।

বীথিকা বলল, হ্যাঁ।

আশালতা বললেন, এই রোদের মধ্যে অতদূরে সেই পার্ক সার্কাসে কেন গিয়েছিলি ? তাকে নিমন্ত্রণ করবি বলে ? তা নিমন্ত্রণের আজই কি। বিয়েব দিন করলেই হতো।

বীথিকা বলল, তা হতো না মা। ঘরে চল তোমাকে সব বলি।

যে ঘরে কাগজে মুখ ঢেকে সুধাময় ঘুমোচ্ছেন সে ঘরে গেলেন না আশালতা। মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে তাব পাশের ছোট ঘরখানায় ঢুকলেন। কাঁচের আলমাবী ভবা বই। তাকের উপর বেডিও সেট। তার নিচে ছোট একখানি টেবিল। দুদিকে দুখানি চেয়াব। এই টেবিলে বসে মেয়েব কাছে জীবনের কত অপূর্ণ সাধ আব স্বপ্নেব কথা বলেছেন আশালতা। সংসারেব কত জটিল আর গুরুতব সমস্যার সমাধান সম্বন্ধে পরামর্শ করেছেন।

আজ আর চেয়ারে বসলেন না আশালতা। টেবিলের ওপব ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, কি বলবি বল। তোর রকম সকম আমার ভালো লাগছে না বাপু।

বীথিকা একটুকাল চুপ কবে থেকে বলল, ভেবেছিলাম, তোমাকে না বলেই পারব। নিজে সারা জীবন দুঃখ পাব ; তবু তোমাকে দুঃখ দেবো না। কিন্তু তা কিছুতেই হল না।

আশালতা বিরক্ত হয়ে বললেন, তোর আর ভণিতা করে কাজ নেই। কি বলবি, সোজা কথায় বল।

বীথিকা বলল, অরুণকে আজ না করে দিতে হবে মা। তাকে আমি বিয়ে করতে পারব না।

আশালতা যেন আকাশ থেকে পড়লেন, সে কিরে? এই ছ'বছর ধরে এত মেলামেশার পর এখন বলছিস বিয়ে করতে পারবি নে? লোকে বলবে কি।

বীথিকা বলল, লোক-নিন্দে আমাকে সইতেই হবে মা। তুমিও তো এক সময় কত সয়েছ।

আশালতা বললেন, না আমি তোমার মত নিন্দার কাজ করি নি। তোমার মত অসম্ভব কথা বলি নি। এত জায়গায় এত বেড়ালি, এত বন্ধুত্ব, এত ভালোবাসা হল তোদের মধ্যে—

বীথিকা বলল, বন্ধুত্ব হয়েছে, কিন্তু ভালোবাসা হয় নি।

আশালতা ধমকে উঠলেন, কি যে বাজে বকিস। তোর বয়সী মেয়ের সঙ্গে আর একটি ছেলের বন্ধুত্বও যা ভালোবাসাও তাই।

বীথিকা বলল, আগে আমিও তাই ভাবতুম, কিন্তু এখন দেখছি তা নয়। তোমার সঙ্গে রাঙা মামার যা সম্বন্ধ এও প্রায় তাই—

আশালতার আর ধৈর্য রইল না, তিনি মুখ বিকৃত ক'রে বললেন, বদমাশ মেয়ে। ও কথা বলতে তোর একটুও লজ্জা হল না, সংকোচ হল না? আমি নিজের চোখে দেখি নি তোদের ঢলাঢলি? এখন ভাই বলে এড়িয়ে যেতে চাস?

বীথিকা শান্তভাবে প্রতিবাদ করল, ভাইতো বলি নি মা, বন্ধু বলেছি। অরুণের সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক গড়ে উঠেছে তা বন্ধুত্বের চেয়ে আলাদা কিছু নয়। হয়ত আরো কিছু হতে পারত যদি আমি তাকে নিজে আবিষ্কার করতাম। কিন্তু তুমি আর রাঙা মামা আমাকে সে কষ্ট স্বীকার করতে দাও নি। তোমরা নিজেরা জাত গোত্র মিলিয়ে তাকে আমার সামনে এনে দিয়ে বলেছ, ওকে ভালোবাস খুকু। আমি

তোমাদের কথা অমান্য করি নি, তোমাদের কথা মত ভালোবেসেছি। কিন্তু তোমাদের কথামত বিয়ে করতে পারব না মা।

আশালতা বললেন, হতচ্ছাড়ি, একথা আমার সামনে বলতে তোর লজ্জা হল না।

বীথিকা বলল, এতদিন লজ্জা করেছি মা। ভেবেছি কি করে মুখ ফুটে বলব। ইশারায় আভাসে বলেছি, কিন্তু তুমি গ্রাহ্য করনি, বুঝতে চাওনি। কারণ অরুণকে তুমি—

আশালতা তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, অরুণকে আমি কি—

বীথিকা বলল, অরুণকে তুমি নিজে বড্ড পছন্দ করেছ মা। তাই আমার অপছন্দেব কথা তুমি সহ্য কবতেও চাও নি, বিশ্বাস করতেও চাও নি। ভেবেছিলাম তোমাকে দুঃখ দেবো না। আমার জন্যে দুঃখ তো তুমি কম পাও নি। সারাজীবন দুঃখ ভোগ করে আমি তার সামান্য অংশ শোধ দেব। কিন্তু আজ ভাবছি এতো শুধু আমার দুঃখের কথা নয় মা, এর সঙ্গে যে আর একজনের সুখ দুঃখও জড়িয়ে আছে। আমার ভুলের জন্যে সাঁরা জীবন অরুণ দুঃখ পাবে—জেনে-শুনে তাই কি আমি হতে দিতে পাবি? অরুণকেও আমি বোঝাতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু সে বুঝতে চায় না। তার ধারণা এ ব্যাপারে তোমার সম্মতি আর তার গায়েব জোবই যথেষ্ট। আমার মতামতের কোন দরকার নেই। কিন্তু তাতে যে দুঃখই বাড়বে মা।

আশালতা স্থির দৃষ্টিতে মেয়েব দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বললেন, ছাখ খুকু, আমি তোর মত লেখাপড়া শিখি নি, কলেজের প্রফেসরও হই নি; তাই বলে তুই আমাকে যত বোকা মনে করিস তাও আমি না। আমার দুঃখের কথা, অরুণের দুঃখের কথা ভাবতে তোর ভারি তো মাথা ব্যথা। তুই তোর নিজের সুখের কথা ভাবছিস। আমাকে সত্যি করে বল কে সে? কার ছলনায় ভুললি তুই। কার ফাঁদে পা দিয়ে অরুণের মত এমন যোগ্য ছেলেকে বাঁ পায়ে ঠেললি? বল আমাকে।

বীথিকা একটুকাল চুপ করে থেকে বলল, মা সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস করো না, সে কথা বলবার সময় এখনো আসে নি।

আশালতা এগিয়ে এসে শক্ত মুঠিতে চেপে ধরলেন মেয়ের কাঁধ, যেন বাঘিনীর থাবা। তারপর তীব্র ঘৃণাভরা চাপা গলায় বললেন, বদমাশ মেয়ে। তোমার আবার আসা না আসা। তোমার আজ একজন আসে, কাল একজন আসে—।

বীথিকা বাধা দিয়ে কাতর স্বরে বলল, মা এসব কি তুমি বলছ। তুমি না আমার মা?

আশালতা অধীর ভাবে বললেন. আমি কোন কথা শুনতে চাই নে, আমাকে তার নাম বল।

বীথিকা অসহায় ভাবে মার মুখের দিকে তাকাল। কে যেন নিষ্ঠুর ভাবে তার মনোসমুদ্র মন্থন করে চলেছে। অমৃত হলাহলে বিচিত্র স্বাদ জীবনের।

বীথিকা আস্তে আস্তে বলল, তার নাম অসীম, অসীম মুখোপাধ্যায়।

আশালতা কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, অবাক করলি তুই। পার্লবোডের সেই আর্টিস্ট! সেই খৃষ্টান ছোঁড়া?

বীথিকা বলল, হ্যাঁ। খৃষ্টান। তাতে কি হয়েছে। সেও চার্চে যায় না, আমিও মন্দিরের দুয়ার মাড়াই না, ধর্মে যাই হোক, জাতে সেও বাঙালী ব্রাহ্মণ।

আশালতা বললেন, ছাই ব্রাহ্মণ। অমন বামুন হওয়ার কোন দাম আছে? যার ধর্ম আলাদা, সমাজ আলাদা? তাছাড়া শুনেছি তার তিনকুলে কেউ নেই।

বীথিকা বলল, তোমার আশীর্বাদ পেলে তার অন্তত এককুল ভরে উঠবে মা।

আশালতা জ্বলে উঠে বললেন, আমার বয়ে গেছে তোমাকে

আশীর্বাদ করতে। আচ্ছা তোর কি প্রবৃত্তি খুকু! জাতের মিল নেই, ধর্মের মিল নেই। ওই তো দাঁড়কাকের মত চেহারা—

বীথিকা তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলল, তার চেহারার কথা থাক মা।

আশালতা বলেন, আচ্ছা না হয় গুণের কথাই ধরি। গুণই বা কি দেখলি ওর মধ্যে? ছবি এঁকে খায়। তাও তো শুনেছি নিজের ছবি বিক্রি হয় না, পরের বইয়ের মলাট এঁকে কোনরকমে নিজের খোরাক পোশাক জোগায়। কি দেখলি তুই তার মধ্যে?

বীথিকা বলল। সে কথা আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না মা।

আশালতা মুখ বিকৃত করে বললেন, ন্যাকা মেয়ে। তুমি এত কথা বলতে পারলে আর সে কথা বলতে পারবে না?

এ কথার উত্তরে বীথিকা মুখ নিচু করে রইল। মনে মনে ভাবল মা নিজেই কি পারত। এতো শুধু চোখের দেখা নয় যে মুখে বলা যাবে।

মেয়ের কাছ থেকে আস্তে আস্তে সরে এলেন আশালতা। এতক্ষণ ধরে ঝগড়া আর বকাবকি করে এবার ভারি ক্লান্তি এসেছে। শাশুড়ী মারা যাওয়ার পর কটুকথা বলবার, এমন কুশ্রী ভাষায় কলহ করবার আর কোন উপলক্ষ ঘটে নি। সর্বাঙ্গ যেন কিসে জ্বলে যাচ্ছে। কে জানে এ কোন্ বিষ। পেট জ্বলছে খিদেয়। এক কাপ চা খেয়ে সকালে কাজ শুরু করেছিলেন, তারপর এক ফোঁটা জলও পড়ে নি।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত এমন বিপদ যে আসবে তা তিনি ভাবতেও পারেন নি। বছর দুই আগে একবার আর্টিস্টকে দিয়ে ঘর সাজাবার শখ হয়েছিল রাঙা বউদির। সেই সূত্রে অসীমের সঙ্গে আলাপ, সেই উপলক্ষেই তার কিছুদিন আনাগোনা। তারপরে খুকুর সঙ্গে বার দুই দেখা হয় আর্ট একজিবিশনে। আর একবার বুঝি রাজগিরে। রাঙাদা, রাঙা বউদি আর খুকু, তিনজনে বেড়াতে গিয়েছিল। গিয়ে দেখে গাছতলায় উবু হয়ে বসে অসীম নিজের মনে

স্কেচ করছে। সে গল্প রাঙা বউদির মুখেও শুনেছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে যে আরো নিগূঢ় কাহিনী লুকিয়ে আছে তা কিছুতেই টের পান নি। দিনের পর দিন তাঁকে ফাঁকি দিয়েছে মেয়ে, আশালতা বুঝতে পারেন নি।

ওরে সর্বনাশী, এ ফাঁকি তুই কাকে দিলি, আমাকে না নিজেকে? মেয়ের ভবিষ্যত দুর্গতির কথা ভেবে চোখ দিয়ে জল বেরোল আশালতার। আবার এগিয়ে এলেন মেয়ের কাছে। পরম স্নেহে পিঠে হাত রাখলেন। সে হাতে এখনো রান্নার গন্ধ, রান্নার দাগ। তারপর কোমল মৃদু স্বরে বললেন, মুখ তোল খুকু। আমার দিকে তাকিয়ে দেখ। এখনো আমার নাওয়া খাওয়া হয় নি। তোর জন্যে, শুধু তোর ভালোর জন্যে···। লক্ষ্মী মা আমার, কথা শোন, এখনো ফিরে আয়।

বীথিকা মুখ তুলল না, কিন্তু কাতর কোমল অনুনয়ের সুরে বলল, আমাকে ক্ষমা কর মা, ক্ষমা কর। আমার আর কোন উপায় নেই।

উপায় নেই!

হঠাৎ যেন স্তব্ধ হয়ে গেলেন আশালতা। মেয়ের দিকে তাকাতে তাঁর আর সাহস হল না। এতক্ষণে তাঁর স্বামীর কথা মনে পড়ল। কি অদ্ভুত মানুষ। এখনো অঘোরে ঘুমোচ্ছেন। এদিকে আগুনে যে সব ছারখার হয়ে গেল সে খেয়াল নেই।

আশালতা ছুটে চলে এলেন নিজেদের শোয়ার ঘরে। সুধাময়ের মুখের ওপর থেকে কাগজখানা এতক্ষণে সরে গেছে কিন্তু চোখের গাঢ় ঘুম একটুও যায় নি।

স্বামীর গায়ে একটু ধাক্কা দিয়ে আশালতা অসহায় ভঙ্গিতে বললেন, ওগো শুনছ? আর কত ঘুমোবে তুমি? এদিকে সর্বনাশ হয়ে গেল যে। তোমার মেয়ে নাকি এক খৃষ্টানকে বিয়ে করেছে।

ঘুমের ঘোরে পাশ ফিরলেন সুধাময়। জড়ানো স্বরে, বোধহয় ঘুমের ঘোরেই জবাব দিলেন,. বেশ করেছে।

নির্বাক আশালতা অপলকে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর পিঠের দিকে। তাঁর নতুন করে চোখে পড়ল রোমশ প্রশস্ত পিঠখানা অবিকল সেই বুড়ো শ্বশুরের মত।

মুক্তপা

শ্যামবাজারের মোড়ে ট্রাম থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নেমে পড়ল। রাস্তা পার হয়ে দু নম্বর বাস ধরব না বাঁ দিকের কাপড়ের দোকানটায় উঠে একটু দাঁড়াব ভাবছি; দোকানের ভিতর থেকে দুটি মহিলা বেরিয়ে এলেন। আমি দুপা পিছনে সরে দাঁড়ালাম। দুটি মেয়ের মধ্যে একটি সধবা, সিঁথিতে সিঁদুর। আর একটি কুমারী। বয়স চব্বিশ পঁচিশ। দেখতে সুন্দরী, গৌরবর্ণা, মুখের ডৌলটি অনেকটা পানের মত। নাকটি বাঁশীর মত না হলেও লম্বা, চোখ দুটি কালো আর বেশ বড় বড়। মোটের ওপর মুখখানা মনে রাখবার মত। তবু ঠিক চিনি চিনি করেও চিনতে পারছিলাম না। মনে হল মেয়েটি আগেই চিনেছে। তার পাতলা দুটি ঠোঁটে এক চিলতে হাসি ফুটে উঠল।

সে বলল, কেমন আছেন?

বললাম, ভাল। আপনাব সব ভাল তো?

মেয়েটি হেসে বলল, হ্যাঁ ভালই। আপনি কিন্তু আমাকে চিনতে পারেন নি।

পাশেব মহিলাটি সঙ্গিনীকে মৃদু স্বরে বললেন, ভদ্রলোক ভিজে যাচ্ছেন যে। কি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল কথা বলছিস।

সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি তার লেডীজ ছাতাটা আমার দিকে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, সত্যি আপনি একেবারে ভিজে গেলেন। এই ছাতাটা নিন। আমি তার সৌজন্যে প্রীত হলাম, কিন্তু ছাতাটি নিলাম না। হেসে বললাম, ও আমার মাথায় মানাবে না। তা ছাড়া আপনাদের তো দেখছি একটি ছাতা সম্বল। দুজনে ভেজার চেয়ে একজন ভেজা ভাল।

মেয়েটি হেসে বলল, জন বিশেষে আছে। অনেক সময় একজন

একশজনের সমান। চলুন তার চেয়ে দোকানের ভিতরে গিয়েই বসি।

আমি বললাম, হ্যাঁ। আপনাদের তো ভিতরে যাওয়ার অধিকার আছে। দোকান থেকে বেশ মোটা রকমের সওদা করেছেন বলে মনে হচ্ছে।

কাগজে মোড়া বাণ্ডিলটার দিকে তাকিয়ে আমি একটু হাসলাম।

ওরা দুজনেও হাসলেন।

এরপর আমরা দোকানের ভিতরে ঢুকে পড়লাম। বৃষ্টির ভয়ে অনেকেই দোকানের সামনে ভিড় করে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েদের দেখে তারা পথ ছেড়ে দিল। লম্বা টুলটার ওপরে কয়েকজন বসেছিল, উঠে দাঁড়াল। একজন মাঝ বয়সী কর্মচারী হেসে বললেন, বৃষ্টির জন্যে যেতে পারলেন না বুঝি? বসুন একটু বসে যান।

আমরা তিনজনে সেই টুলের ওপর বসলাম।

মেয়েটি আর একবার হেসে বলল, আপনি কিন্তু এখনো চিনতে পারেননি। এত কথাবার্তা, এত আলাপ—, তার সঙ্গিনীটি নিচু গলায় আবার তিরস্কার করলেন, কি বাজে ইয়ার্কি দিচ্ছিস, পরিচয় দিলেই হয়।

আমি একটু অস্বস্তি বোধ করছিলাম। সত্যিই মুখটা চেনা চেনা লাগলেও কোথায় দেখেছি, কিন্তু এর নাম মোটেই মনে করতে পারছিনে।

আমার বিব্রত ভাব দেখে মেয়েটি এবার আত্মপরিচয় দিয়ে বলল, আমার নাম সুতপা গুহ। আপনারা যখন লিনটন স্ট্রীটে ছিলেন তখন গিয়েছিলাম অতসীর সঙ্গে। মনে পড়ছে এবার?

স্বীকার করে বললাম, পড়ছে।

অতসী সান্যাল আমার এক সাংবাদিক বন্ধু সুখেন্দু সন্যালের স্ত্রী। বছর দেড়েক আগে একদিন সন্ধ্যায় তাঁরা আমাদের লিনটন স্ট্রীটের বাসায় বেড়াতে গিয়েছিলেন। অতসীর সহপাঠিনী সুতপাও ছিল

সঙ্গে। নমস্কার বিনিময়ের পর সামান্য দু একটা কথা বলেছিল সুতপা। যতদূর মনে পড়ে সেদিন তাকে এমন হাসি খুশী এতটা সপ্রতিভ দেখিনি। বরং গম্ভীর মুখে কোণের দিকের একটা চেয়ারে বসে সুতপা র‍্যাক থেকে একখানা বই তুলে নিয়ে তার পাতা ওলটাচ্ছিল। সারাক্ষণ মুখটা প্রায় ঢাকাই ছিল সেই বইয়ের পাতায়।

আমার মনে হয়েছিল মেয়েটি বয়সের তুলনায় একটু বেশী গম্ভীর আর বিমর্ষ। কিছুটা অসামাজিকও বটে। আমাদের বাসায় এই প্রথম এসেছে। কিন্তু কারো সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার তেমন ঔৎসুক্য নেই। বই পড়ছে তো বই-ই পড়ছে। আমার স্ত্রীও তার ভাবভঙ্গী দেখে খুব বিস্মিত হয়েছিল। অথচ মেয়েটির শুধু রূপ আছে তাই নয় বিদ্যাও আছে। হিস্ট্রিতে সেকেণ্ডক্লাস পেয়েছে। নিজের রূপগুণ সম্বন্ধে মেয়েটি কিন্তু একটু বেশী সচেতন। সেদিন অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও এক কাপ চা ছাড়া তাকে আর কিছুই খাওয়ানো যায়নি। পীড়াপীড়িতে সুতপা একটু বিরক্ত হয়েছিল। রেখাকে বলেছিল, মাফ করবেন। আমি ওসব কিছু খাইনে। তা ছাড়া শরীরটা তেমন ভাল নেই আমার।

আজ সুতপাকে দেখে এবং তার সঙ্গে এতক্ষণ আলাপ করেও কেন যে তাকে পুরোপুরি চিনতে পারিনি এবার বুঝতে পারলাম। শুধু যে আগের চেয়ে মেয়েটি স্বাস্থ্যবতী হয়েছে তাই নয়, ওর স্বভাবের সেই গাম্ভীর্য্য আর বিষণ্ণতাও ঝরে পড়েছে। আকৃতি প্রকৃতিতেও যেন স্বতন্ত্র আর একটি মেয়ে। দেড় বছর আগের একটি সন্ধ্যায় বইয়ের পাতায় আধখানা মুখ ঢাকা যে মেয়েটিকে দেখেছিলাম, এ সুতপা যেন সে নয়। আর ওর নামটিও এত প্রচলিত নয় যে শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনে থাকবে।

সুতপা আমার মনের ভাব খানিকটা অনুমান করতে পেরে বলল,

সেদিন আমার ওপর নিশ্চয়ই আপনারা খুব রাগ করেছিলেন। মেজাজটা এত খারাপ ছিল যে সেদিনকার ব্যবহারের জন্যে আমি ভারি লজ্জিত। কিছু মনে করবেন না যেন। তারপর ফের একটু হেসে বলল, মনে আর কি করবেন। রাগ করে তো মন থেকে তাড়িয়েই দিয়েছিলেন।

তারপর সেই বিবাহিতা মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বলল, দিদি, তুই বোধ হয় এতক্ষণ ধরে রাগে টগবগ করছিস। কল্যাণবাবুর সঙ্গে আমি একাই আলাপ করছি, তোর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিইনি। ফের আমার দিকে চেয়ে বলল, আমার দিদি সুলতা নন্দী। জামাইবাবুকে সুখেন্দুবাবু চেনেন। প্রসাদ নন্দী ইঞ্জিনিয়ার, ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টে আছেন আজকাল।

সুতপার চেয়ে বছর দু তিনের বড়। শাড়ী গয়নায় বেশ সম্ভ্রান্ত ঘরের বধূ বলেই মনে হচ্ছিল। সে একটু লজ্জিত হয়ে বোনকে বাধা দিয়ে বলল, থাক থাক। তোকে আর কুলপঞ্জী বার করতে হবে না।

একটু চুপ করে থেকে সুতপা অপ্রতিভ হয়ে বলল, ওমা, আপনার পরিচয়ই তো দেওয়া হল না। ইনি কল্যাণবাবু। লেখক শ্রীকল্যাণ কুমার রায়।

সুলতা বলল, তোকে আর অত ব্যাখ্যা করতে হবে না। আমি দেখেই চিনেছি। আমাদের পাড়ার একটা সভায় গিয়েছিলেন গতবার। আমি ছিলাম সেখানে।

সুতপা বলল, এখন আর সে কথা কে বিশ্বাস করবে। যদি চিনেই ছিলি আগে বলিসনি কেন।

বৃষ্টি থেমে গিয়েছিল। আমরা উঠে পড়লাম।

দোকানের বাইরে ফুটপাতে নেমে এসে হঠাৎ সুতপা বলল, অতসীর কাছে শুনেছি আপনি আবার বাসা বদল করেছেন। কোথায় আছেন আজকাল? আপনার ঠিকানাটা দিন। আবার কবে কোন্

রাস্তার মোড়ে কোন্ এক বৃষ্টির দিনে দেখা হবে সেই ভরসায় না থেকে ঠিকানা জেনে রাখা ভাল। তারপর একটু হেসে বলল, এমন আকস্মিক দেখা সাক্ষাৎ গল্পে আপনারা অনেকবার ঘটাতে পারেন। কিন্তু জীবনে তো এক আধবারের বেশি ঘটে না।

হেসে বললাম, ঠিক উল্টো। আকস্মিক দেখাটা জীবনেই বরং অনেকবার ঘটে, কিন্তু গল্পে একবার ঘটালেই আপনারা—পাঠক-পাঠিকার দল হৈ হৈ করে ওঠেন।

আমার কাছে টুক্‌রো কাগজ নেই। সুলতা সুতপার কাছেও না। সবাই বিব্রত। কি করে ঠিকানা বিনিময় করা যায়। শেষে আমি বললাম, এক কাজ করুন। প্যাকেট থেকে এক টুক্‌রো কাগজ ছিঁড়ে নিন। তাতেই চলবে। মিনিট কয়েকের মত ওতেই লিখে নিন ঠিকানাটা। তারপর বাসায় যেতে যেতে হাওয়ায় আপনিই উড়ে যাবে।

আমার ঠিকানা লিখে নিল সুতপা—নিজেদের ঠিকানাটাও লিখে দিল। তারপর আমার কথার জবাবে বলল, তাই বুঝি ভাবেন? আমাদের ঠিকানা আপনি হারিয়ে ফেলতে পারেন কিন্তু আপনার ঠিকানা আমাদের কাছে ঠিকই থাকবে।

এরপর সুতপারা বিদায় নিল। অনুরোধ করে গেল, যাবেন একদিন, অবশ্য যাবেন।

আমি দু নম্বর বাসে উঠলাম। ওরা সিঁথির বাস ধরল। আসতে আসতে ভাবলাম—আজ কিন্তু মেয়েটিকে মন্দ লাগল না। কিন্তু সেই প্রথম দিন কি ভিন্ন চেহারাই না ছিল মেয়েটির। শুকনো মুখ, রুক্ষ ভাব, যেন মূর্তিমতী নিরসতা। আজ কিন্তু আলাপে কথায় বার্তায় বেশ উজ্জ্বল আর প্রাণবন্ত বলে মনে হল সুতপাকে।

অবশ্য সেদিনের সেই বিরূপতার কারণ সুখেন্দু আর অতসীর মুখে পরে একদিন শুনেছিলাম। সুতপা আমাদের ওখানে সেদিন

আসতে চায়নি। স্বামী-স্ত্রীতে জোর করে ধরে এনেছিল তাকে। তার দুদিন আগে সুতপা নাকি বাপ-মার সঙ্গে ঝগড়া করে অতসী-দের বাড়ী ভবানীপুরে চলে গিয়েছিল।

ঝগড়ার কারণ সুতপার বিয়ের সম্বন্ধ। ওর বাবা ভবরঞ্জন গুপ্ত বেশ পসারওয়ালা উকিল। বাড়ী করেছেন বরানগরে। দুটি মেয়ে ভদ্রলোকের। ছেলে নেই। মেয়েদেরই ছেলের মত করে মানুষ করেছেন। লেখাপড়া শিখিয়েছেন। বড় মেয়েটিকে বেশ দেখে শুনে বিয়ে দিয়েছেন। অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে। দীনেন্দ্র স্ট্রীটে নিজেদের বাড়ী আছে। বাপ-মা ভাই-বোন পাঁচজন আছে সংসারে। জামাই দেখে আত্মীয় স্বজন সবাই খুশী। ছোট মেয়ে সুপতার রূপ তার দিদির চেয়ে বেশি। চালাক-চতুরও খুব। বি এ পড়তে পড়তে সুলতার বিয়ে হয়ে যায়। তারপর আর পড়া এগোয় না। সুতপা বিনা বাধায় এম-এ পাশ করে। তার আগে থেকে সুতপার ভাল ভাল সম্বন্ধ আসছিল। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, ইউনিভারসিটির লেক্চারার, সমাজে যাদের প্রতিষ্ঠা আছে, যাদের কারো সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিলে ভবরঞ্জনবাবু জামাই সম্বন্ধে জাঁক-জমক করতে পারতেন, তাদের কাউকেই সুতপার পছন্দ হল না।

আমি অতসীকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, না হওয়ার কারণ? অতসী হেসে বলেছিল, কারণ আবার আপনাকে খুলে বলতে হবে নাকি? তাহলে আর ছাই কি গল্প লিখছেন এতকাল ধরে?

বলেছিলাম, বুঝেছি। সুতপার বুঝি আরো উঁচু নজর। জজ ম্যাজিস্ট্রেট—না-কি একেবারে ক্যাবিনেটের দিকে চোখ?

অতসী জবাব দিয়েছিল, ছাই বুঝেছেন। মেয়ের উঁচু নজর হলে তো সুতপার বাবার কোন দুঃখই ছিল না। ছোট মেয়ের জন্যে মেসোমশাই সর্বস্ব পণ করতে পারতেন, মানে সর্বস্ব পণ দিতে পারতেন। চোখ নিচের দিকে।

তারপর ব্যাপারটা আরো খুলে বলেছিল অতসী। সে নীচু আবার যে সে নীচু নয়। একেবারে খাদু। সাধারণ গ্রাজুয়েট। এম এ-তে ভর্তি হয়েছিল। কিন্তু বেশীদিন পড়েনি। রেলওয়েতে অল্প মাইনের চাকরি। ক্লেরিক্যাল পোস্ট। ভাড়াটে বাড়ীতে থাকে। সংসারে বিধবা মা আর অনূঢ়া একটি বোন্ আছে। এমন একটি সাধারণ ছেলেকে যে পাত্র হিসেবে সুতপা পছন্দ করে বসবে তা কেউ ভাবতে পারেনি। প্রথমে বাপ মার কাছে এই ছেলেটির নাম গোপন রেখেছিল সুতপা। পরে জানাজানি হয়ে গেল। অবশ্য অনিল সরকার তাঁদের অপরিচিত ছিল না—পাড়ারই ছেলে। কাছাকাছি বাসা। সেই সূত্রে যাওয়া আসা, মেলামেশা। তার পরিণাম এতদূর গড়াবে কে জানত?

প্রথমে মেয়ের ওপর খুবই রাগ করলেন ভবরঞ্জন। যা নয় তাই বলে গালাগাল দিলেন। সুতপাদের বাড়ীতে অনিলের আসা যাওয়া বন্ধ হল। তারপরে জোর করে এক বিলাত ফেরত ডাক্তারের সঙ্গে সুতপার বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করলেন তিনি। ঝগড়া-ঝাঁটি হৈ চৈ কান্নাকাটি। সুতপার মা বললে, তুই যদি এ বিয়ে না করিস, আমি গলায় দড়ি দিয়ে মরব।

বাবা বললেন, আমি সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হয়ে যাব, তুই তোর জেদ নিয়ে থাক।

কি এক দুর্বল মুহূর্তে রাজী হয়ে গেল সুতপা। বলল, বেশ, হোক তাহলে বিয়ে।

ভাবল, বাপ মার সন্তুষ্টির জন্যে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ত্যাগ করবে। বাপ মা ভাবলেন এখন মেয়ের অমতে বিয়ে দিলেও পরে সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম বয়সের চোখের নেশা আর কতদিন থাকে। স্বামী সংসার ছেলেপুলে হলেই সব ভুলে যাবে।

বিয়ের দিন তারিখ পর্য্যন্ত ঠিক হয়ে গেল। জামাই পণ নেবে

না তাই যৌতুক দিয়ে সব পূরণ করে দিতে হবে। ভবরঞ্জন ভাবলেন হাজার কয়েক টাকা দিয়ে নতুন মডেলের একখানা গাড়ীই কিনে দেবেন জামাইকে। সেই জন্যে এক গাড়ী-বিশেষজ্ঞ বন্ধুকে নিয়ে বেরিয়েছেন চৌরঙ্গীর দিকে, মা গেছেন বড় জামাই মেয়েকে নিয়ে বউবাজারের গয়নার দোকানে, ফিরে এসে দেখেন মেয়ে নেই। টেবিলের ওপর চীনে-মাটির ছাইদানি চাপা দেওয়া এক টুকরো কাগজ—বাবা পারলাম না। আমাকে ক্ষমা কর।

হৈ হৈ হুলস্থূল কাণ্ড। নিশ্চয়ই অনিলের সঙ্গে পালিয়েছে মেয়ে। আর খোঁজ করে লাভ নেই। তবু লোক ছুটল অনিল সরকারের বাসায়। তার মা তো অবাক। অনিল পালাবে কি করে। সে দুদিন ধরে জ্বরে শয্যাশায়ী।

সারারাত উদ্বেগ, দুশ্চিন্তা। থানা হাসপাতালে ঘোরাঘুরি। পরদিন ভোরে অতসী নিজে গিয়ে সুতপার বাবাকে খবর দিল—সুতপা তাদের কাছে আছে। তার জন্যে যেন কেউ চিন্তা না করে। ভবরঞ্জন দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, চিন্তা! ও মেয়ে মরে গেলেও আমার কোন দুঃখ নেই। ওর মুখ আমি আর দেখব না। এ বাড়ীর দোর চিরদিন ওর কাছে বন্ধ হয়ে গেছে। একথা বলে দিয়ো ওকে।

তখন দিন পাঁচ-ছয় সুতপা অতসীর কাছে ছিল। সেই সময় তারা ওকে আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে নিয়ে যায়। না নিয়ে করবে কি। আবার যদি কোন দিকে চলে যায় মেয়ে! সেই আশঙ্কা খুবই ছিল তখন। সপ্তাহ খানেক পরে সুতপার দিদি আর ভগ্নীপতি এসে তাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে বাড়ী নিয়ে যায়। বিলাত ফেরত সেই ডাক্তারকে অতসী আর সুতপা দুই বন্ধুতে মিলে সব কথা খুলে একখানা চিঠি লিখেছিল। সাহিত্যমূল্যে সে চিঠি নাকি অনবদ্য। সে চিঠি যদি কোনদিন প্রকাশিত হয় তাহ'লে হয়ত দেখা যাবে পৃথিবীর কোন প্রেমপত্রই সেই প্রত্যাখানলিপির মত বিষাদ মধুর নয়।

তারপর বাপ মেয়ের মধ্যে বহুদিন কথা বন্ধ ছিল। তবে ভবরঞ্জন আত্মীয়স্বজনের কাছে বলেছেন যে সুতপা যে বেশী কেলেঙ্কারী করেনি, বিয়ে না করে ছোঁড়াটার সঙ্গে পালিয়ে যায়নি, কি লুকিয়ে গিয়ে ম্যারেজ রেজিস্টারের শরণ নেয়নি—তাতে নিজের মেয়ের বুদ্ধি বিবেচনার ওপর তাঁর একটু আস্থা হয়েছে। আর যাই হোক মেয়েটা যে একেবারে নিষ্ঠুর নয়, বাপ মার মুখের দিকে একটু অন্তত তাকায় এ বিশ্বাস হয়েছে তার।

তারপর সুতপা পাড়ার স্কুলের টিচারি ছেড়ে দিয়ে কমার্শিয়াল ইনটেলিজেন্স অফিসে চাকরি নেয়। ভবরঞ্জন তাতে আপত্তি করেন না। বড় অফিসে কাজ করে, বড় বড় অফিসারদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে মেয়ের নজর যদি একটু উঁচু দিকে যায় সেই আশা ছিল। কিন্তু সুতপা সেদিকে মোটেই ঘেঁষল না। তবে অনিলের সঙ্গে বাইরে দেখা সাক্ষাৎ করলেও তাকে বাড়ীতে ডাকল না, বিয়েও করল না। দিদি ভগ্নীপতি আর ছোট বোনকে বলে দিল সে চিরকুমারী হয়ে থাকবে। অনিল রইল ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা নিয়ে। আর কোথাও বিয়ে করল না।

ভবরঞ্জন মেয়েকে বললেন, সে-ই ভাল। যে রকম অবাধ্য মেয়ে তুই, আর যা তোর বেয়াড়া মতিগতি তাতে সন্ন্যাসিনী হয়ে থাকাই ভাল। ঘর সংসার পেতে কাজ নেই তোর।

কাহিনীর এইটুকু পর্য্যন্ত শোনা ছিল আমার। তারপর শ্যামবাজারের মোড়ে দেখা সুতপার সঙ্গে। ভেবে পেলাম না বিরহিণী সন্ন্যাসিনী হঠাৎ অমন হয়ে উঠল কেন। জীবনে কোন্ সিদ্ধি, স্বার্থকতার সাক্ষাৎ পেল সুতপা। অবশ্য একেবারে যে কিছু অনুমান করতে পারিনি তা নয়। প্রমোশন কি বেতন বৃদ্ধিতে নিশ্চয়ই তার অত আনন্দ হয়নি। আরো গভীর আরো বেশী অর্থবহ কারণ কিছু আছে—তখনই অনুমান করেছিলাম।

আমার অনুমান যে মিথ্যে হয়নি সপ্তাহখানেক বাদে তার প্রমাণ পেলাম। সেদিন সন্ধ্যার পরে অতসীকে নিয়ে সুতপা এসে হাজির।

বললাম, কি ব্যাপার।

অতসী বলল, এই বেড়াতে এলাম আপনাদের এখানে।

ওকে মুখ টিপে টিপে হাসতে দেখে, বললাম, শুধু বেড়াতে? অতসী বলল, না রথ দেখা আর কলা বেচা দুই-ই এক সঙ্গে সারব। সুতপার বিয়ে। আপনাদের নিমন্ত্রণ করতে এসেছে। ওর দিদির শরীর ভাল না। তাই ভবানীপুর থেকে আমাকে ধরে নিয়ে এসেছে। কত কাণ্ড করলেন তাতে লজ্জা নেই। আর এখান থেকে এখানে আপনাকে নিমন্ত্রণ করে যাবে তাতে কি লজ্জা।

হেসে বললাম, কার সঙ্গে বিয়ে হচ্ছে? সেই অনিল সরকারের সঙ্গেই তো?

অতসী ভ্রূ কুঁচকে না চেনার ভান করে বলল, ওমা অনিল সরকার আবার কে? ওর বিয়ে হচ্ছে গদাধর সেহানবীশের সঙ্গে। কি বলিস সুতপা তাই না?

সেই প্রথম দিনের মত আজও সুতপা খাটের ওপর পা ঝুলিয়ে বসে একটা বই দেখতে লাগল। আজও দেখলাম ওর আধখানা মুখ ঢাকা। কিন্তু সেদিনের আচরণের সঙ্গে আজকের আচরণের তফাত আছে।

রেখা আজ চা জলখাবারের ব্যবস্থা করায় সুতপা মোটেই আপত্তি করল না। বরং উঠে গিয়ে তাকে সাহায্য করতে বসল।

আমি সেই ফাঁকে অতসীর কাছ থেকে সুতপাদের গল্প শুনতে লাগলাম। দুইটি তরুণ তরুণীর মন দেওয়া নেওয়ার চির পুরাতন গল্প। অতসী ঘনিষ্ঠ বন্ধু সুতপার। গোড়া থেকেই সব কথা সে অতসীকে বলত। যেটুকু বলত না, অতসী তা জিজ্ঞাসা করে নিত। জিজ্ঞাসা করেও যা জানতে পারত না, তা অনুমান করত। আর অতসীর অনুমান প্রায় কোন ক্ষেত্রেই মিথ্যা হত না।

তখন সুতপার বাবা নতুন বাড়ী করেছেন বরানগরে। নিজেদের বাড়ী হলেও পুরোন বন্ধুবান্ধব সব ছেড়ে সেই শহরতলীতে গিয়ে সুতপা বেশ অসুবিধা বোধ করত। কারো সঙ্গেই সহজে আলাপ পরিচয় হয় না। গায়ে পড়ে সুতপাও গিয়ে আলাপ করতে পারে না। এই রকম চলছে। হঠাৎ অনিলের সঙ্গে বাসে আলাপ হয়ে গেল। সুতপা তখন ফিপ্‌থ ইয়ারের ছাত্রী। কলেজ স্ট্রীট থেকে বিকেল পাঁচটার পর ট্রামে উঠেছে। সারা ট্রাম লোকে বোঝাই। অনেকেই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে। বসবার কোথাও জায়গা নেই, শুধু সুতপার পাশেব সীটটি ছাড়া। একজন যাত্রীকে ভদ্রতা করে সেখানে বসতে বলা যায়। সুতপা একবার ভাবছে বলে, আব একবার ভাবছে যাকগে। এর মধ্যে একটি পরিচিত মুখ চোখে পড়ল। তাদেরই পাড়ার ছেলে। ওদের বাড়ীর পাশ দিয়েই সুতপার যাতায়াতের পথ। বহুদিন দেখেছে সুতপা যখন কলেজে বেরোচ্ছে, ও তখন অফিসে যাওয়ার উদ্যোগ করছে। কোনদিন হযতো একই সঙ্গে বেরিয়েছে, একই বাসে উঠছে, শ্যামবাজারে নেমে একই সময় বাস বদল কবেছে। তবু কারো সঙ্গে কোন কথাবার্তা হয়নি। একজন আর একজনেব দিকে একবাব তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিয়েছে। এত দেখা সাক্ষাৎ হওয়া সত্ত্বেও পরিচয় হয়নি। কারণ মধ্যস্থ হয়ে কেউ তাদের পবিচয় কবিয়ে দেয়নি। কিন্তু সেদিন সুতপা ভদ্রতা কবে বলল বসুন।

পাশে বসে অনিল কিন্তু অপরিচিত ব্যক্তির মত চুপ করে রইল না, কি মুখ ফিরিয়ে রইল না। হেসে বলল, ভাগ্যে আপনি বললেন নইলে আমিই হয়ত বলে বসতাম, দয়া করে একটু বসতে দেবেন?

সুতপাও হাসল, আর আমি যদি বলতাম, না। দুঃখিত। তাহলে কি করতেন?

অনিল বললে, তাহলে আপনাকে স্তম্ভিত করে জোর করেই এখানে বসে পড়তাম।

সুতপা হেসে বলল, তার ফল খুব খারাপ হতে পারত। তেমন দুঃসাহস কোনদিন করবেন না।

এমনি করে আলাপ। তারপর দেখা গেল সুতপার কলেজ যাওয়ার সময় আর বাড়ী ফেরার সময়ের সঙ্গে অনিলের অফিস টাইমের বেশ মিল আছে। ট্রামে বাসে খালি বেঞ্চ পড়ে থাকা সত্ত্বেও দু'জনে এক জায়গায় বসে কথা বলতে বলতে চলেছে কিন্তু বাস তো ওদের দু'জনের নয়। পাড়ার নানা বয়সী বহু লোক তাতে ওঠে। তাদের চোখে পড়ল। কথা উঠল পাড়ায়। নতুন দোতলা বাড়ীর এম এ পড়া সুন্দরী মেয়েটির সঙ্গে অনিল সরকারের আলাপ হয়েছে। শুধু আলাপ নয় ঘনিষ্ঠতা। যে অনিল সরকার একতলা ভাড়াটে বাড়ীতে থাকে, রেল অফিসে সাধারণ চাকরি করে, কথায়-বার্তায় চাল-চলনে যার কোন বৈশিষ্ট্যই এতদিন কারো চোখে পড়েনি, তার এই সৌভাগ্যে পাড়ার অনেকেরই ঈর্ষা হল।

একদিন সুতপার বাবা বললেন, তোর সঙ্গে নাকি পাড়ার কোন একটি ছেলের আলাপ হয়েছে?

সুতপা বলল, হ্যাঁ বাবা। অনিল সবকার। তুমি কার কাছ থেকে শুনলে?

ভবরঞ্জন গম্ভীরভাবে বললেন, শুনেছি। তা পথে ঘাটে আলাপ করিস কেন? বাড়ীতে ডাকলেই হয়। একদিন চা খেতে না হয় ডাক। আমাদের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় হোক।

সুতপা লজ্জিত হল। ভাবল তাইতো। অনেক আগেই তো ডাকা উচিত ছিল। তারপর এক ছুটির দিনের বিকেলে চায়ের আসরে অনিলকে নিমন্ত্রণ করল সুতপা। আলাপ করিয়ে দিল বাবা, মা, দিদি, ভগ্নীপতির সঙ্গে। শ্যামবর্ণ, লম্বা ছিপ ছিপে চেহারা।

স্বাস্থ্য ভাল নয়, সুপুরুষও বলা চলে না। বয়স বছর চব্বিশ পঁচিশ। কথা-বার্তায় তেমন চটপটে নয়, বরং একটু লাজুক ধরনের। দেখে শুনে সুতপার বাবা মা নিশ্চিন্ত হলেন, অনিল সম্বন্ধে তাঁদের আশঙ্কা করবার কিছু নেই। রূপে গুণে সব দিক থেকে তাঁদের মেয়ে উঁচু। অনিলের মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে সুতপা তার দিকে আকৃষ্ট হতে পারে। তবে আলাপ পরিচয় হয়েছে—হোক না। তাঁদের মেয়ে তো আর পর্দ্দানশীন নয়। ইউনিভারসিটিতে পড়ে। কতজনের সঙ্গে কত উপলক্ষে তার আলাপ হবে, পরিচয় হবে। তাতে দোষের কি আছে। বরং বেশি কড়াকড়ি করাটাই খারাপ। ভবরঞ্জনবাবুদেরও পাল্টা নিমন্ত্রণ করল অনিল। বাবা মার সঙ্গে সুতপা সেই প্রথম গেল অনিলদের বাড়ীতে। অনিলের মা বেশ সুগৃহিণী। অবস্থা তেমন ভাল নয়। কিন্তু হঠাৎ দেখে তা বোঝা যায় না। সাজানো গোছানো সংসার। বোন নীলিমার পড়াশুনা বেশিদূর এগোয়নি। বিয়ের কথা-বার্তা চলেছে।

মাস কয়েকের মধ্যে অনিলের আরো গুণাগুণ চোখে পড়ল। দেখা গেল পাড়ার উঠি উঠি করা লাইব্রেরীটা আবার চলতে শুরু করেছে। কমিটির সেক্রেটারীর সঙ্গে আলাপ করে নিজে হয়েছে অবৈতনিক লাইব্রেরীয়ান। অল্পদিনের মধ্যে বইপত্র আর খাতাপত্রের চেহারা পাল্টে গেছে। লোকজনের ভিড় বাড়ছে। অফিসের ছুটির পর আগে বাসা থেকে বড় একটা বেরোত না অনিল। আজকাল সন্ধ্যার পর রোজ লাইব্রেরীতে গিয়ে বসে। ছেলেদের সঙ্গে সাহিত্য রাজনীতি শিল্প সংস্কৃতি নিয়ে আলাপ আলোচনা জমে ওঠে।

সুতপাও মেম্বর হয়েছিল। বাড়ীর চাকর দিয়ে মার জন্যে সে বইটই আনাত। নিজে বড় একটা যেত না। কিন্তু বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে না গিয়ে পারল না। শুধু যাওয়া নয়, অংশ নিতে হল উদ্বোধন আর সমাপ্তির সঙ্গীতে। সেক্রেটারী যে বার্ষিক বিবরণী

পড়লেন তা যে অনিলেরই লেখা সে কথা গোপন রইল না। বার্ষিক উৎসবের পর রবীন্দ্র-জয়ন্তী, রজত জয়ন্তীর পর বিজয়া সম্মেলন। সব ব্যাপারেই সুতপার সহযোগিতা চাই, চাই পরামর্শ। প্রোগ্রামের খসড়া সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা। সুতপারও বেশ আগ্রহ দেখা গেল। পাড়ার যে লাইব্রেরী আর ক্লাবের কাজকর্মকে সুতপা নিতান্তই ছেলেখেলা আর হৈ চৈ বলে মনে করেছিল সেগুলি সম্বন্ধেও তার উৎসাহ লক্ষ্য করল সবাই। পাড়ার অন্য মেয়েরা তেমন যায় না বলে সুতপাও যেত না। কিন্তু অনিল আসত। একা নয়, কলেজে পড়া আরও দু' তিনটি ছেলে নিয়ে। নিজেদের ড্রয়িংরুমে বসে সুতপা তাদের সঙ্গে আলাপ করত। এমন কি লম্বা বক্তৃতাও দিত। সুলতা মাঝে মাঝে ঠাট্টা করে বলত, কিরে তুই যে একেবারে দেশনেত্রী হয়ে পড়লি। দেশ তো উদ্ধার হয়ে গেছে এখন কাকে উদ্ধার করবি কে জানে।

ঠিক এই সময় অতসী একদিন বেড়াতে যায় সুতপাদের বাড়ীতে। সারাদিন থাকে। অনিলের সঙ্গে তখন পরিচয় করিয়ে দেয় সুতপা। অবশ্য তার আগে এই নতুন কর্মবীরের গল্প বন্ধুর কাছে শুনেছে সে।

যাওয়ার সময় অতসী ঠাট্টা করে বলল, 'এত ভাল ভাল ছেলেদের তুই কাছে ঘেঁষতে দিলিনে, এই অফিস ক্লার্কের ভিতরে কি পেলি তুই? ঘষা কাঁচের চেয়ে বেশি দাম কি ওর কেউ দেবে? সুতপা বলল, আমি তো দাম দিতে বলিনে।

অতসী বলল, ওরে বাবা। কিন্তু তুই কি পেয়েছিস শুনি?

সুতপা বলল, কি আবার পাব? বন্ধুত্ব।

বন্ধুত্ব ছাড়া যে তাদের মধ্যে আর কিছু আছে সেকথা সুতপা প্রথম প্রথম কিছুতেই স্বীকার করত না। এমন কি এম এ পাশ করে বেরিয়ে আসবার পরেও নয়। কিন্তু স্বীকার না করলেও

কলেজ স্ট্রীট অঞ্চলে ওদের দু'জনকে একসঙ্গে চলাফেরা করতে, কফি হাউস কি ওয়াই এম সি এ থেকে বেরুতে দেখা গেল।

এ যে নিছক বন্ধুত্ব ছাড়া কিছু নয়, সুতপার মনেও সেই ধারণা ছিল। কিন্তু যত তার ভাল ভাল বিয়েব সম্বন্ধ এল তত জোরের সঙ্গে 'না' করতে লাগল। বিয়েতে তার ইচ্ছে নেই, বিয়েতে তার অরুচি। কিছুতেই নিজের মনকে সে বুঝে উঠতে পারছে না।

অনিলের সম্বন্ধে তার সত্যিকারের মনোভাব কি তা জানবার জন্যে অতসী কতবার চেষ্টা করেছে। রেস্টুরেন্টের পর্দা ঢাকা কামরায় চায়ের কাপ সামনে নিয়ে বন্ধুর মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণ করেছে কতবাব তার ঠিক নেই। সুতপা জোর দিয়ে বলেছে তাদের মধ্যে কিছু হয়নি। শুধু বন্ধুত্ব সহকর্মিত্ব ছাড়া আব কিছু নয়। শুধু এর ভরসা করে বেশীদূর এগোন যায় না। অনিলও ধরা ছোঁয়া দেওয়ার মত ছেলে নয়। বাসে সেই প্রথম পাশে বসার সময় সে বলেছিল বটে যে সুতপা তাকে না বললেও সে তাব পাশে বসতে পারত। কিন্তু যত সাহস তার মুখেই। সুতপার সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠতা, এত আলাপ পরিচয় হওয়া সত্ত্বেও অনিল সীমা ডিঙায়নি। অধীরতা, অসহিষ্ণুতার পবিচয় দেয়নি। সুতপার কখনো মনে হয়েছে এ তাব ভীরুতা, ইনফিরিয়রিটি কম্‌প্লেক্স, আবাব কখনো মনে হয়েছে ঔদাসীন্য অনাগ্রহ।

এই সময় বাপের পীড়াপীড়িতে সেই ডাক্তার ভদ্রলোকের সঙ্গে সুতপা বিয়েতে মত দিয়ে বসল। কিন্তু যতদিন যেতে লাগল তত মনের ছটফটানি বেড়ে চলল। ছিঃ ছিঃ ছিঃ, এ সে কি করল। যার সঙ্গে একদিনেব মাত্র আলাপ হয়েছে, যার চেহারা থেকে শুরু করে, চালিয়াতি ধরন ধারন কথাবার্তা কিছুই পছন্দ করতে পারেনি তাকে সে বিয়ে করবে কি করে? যদিবা বিয়ে করে, ভালোবাসবে কি করে? এ তো শুধু বাপ মার ওপর ভক্তির কথা নয়, এ যে

সারাজীবনের ব্যাপার, অনেক গভীর অনেক গুরুত্বপূর্ণ, অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কারো মন রাখবার জন্যে, কারো মান রাখবার জন্যে বিয়েকে সে কিছুতেই একটা দুর্ঘটনা করে তুলতে পারে না। বাপকে সন্তুষ্ট করবার জন্য সে বিয়ে না করে থাকবে, কিন্তু যাকে ভালোবাসেনি তাকে বিয়ে করবে না।

তবে কাকে ভালোবাসে সুতপা। কাউকে না, কাউকে নয়।

ঠিক সেই সময় অসুস্থ দুর্বল শরীর নিয়ে অনিল একদিন গিয়ে হাজির হল অতসীদের বাসায়। সুতপা তখনো সেখানে।

অতসী আর সুখেন্দু তো অবাক।

অতসী বলল, আপনি এলেন কি করে? এমন অসুখ বিসুখ নিয়ে কেউ কি ট্রামে বাসে ওঠে? আপনি কি সুতপার খোঁজে বেরিয়েছেন?

অনিল জবাব দিল, না খোঁজে বেবোইনি। সে যে আপনাদের এখানে আছে তা জানি।

তবে কি জন্যে এসেছেন?

অনিল বলল, এসেছি কৈফিয়ত চাইতে।

সুতপা পাশের ঘরে ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে ফোঁস করে উঠল, কিসের কৈফিয়ত? তোমার কাছে আমার কোন কৈফিয়ত দেওয়ার নেই।

অনিল বলল, নিশ্চয়ই আছে। তোমার ব্যবহারের জন্যে লোকে যে আমাকে দায়ী করবে, লোকে যে আমাকে মিথ্যে অপবাদ দেবে—আমিই তোমাকে লুকিয়ে রেখেছি তা আমি কেন সহ্য করব?

সুতপা বলল, কে বলে সহ্য করতে? সহ্য না করলেই হয়। অনিল বলল, ও কথা বলা সহজ। পাড়ায় আমার মুখ দেখাবার পথ তুমি বন্ধ করলে।

সুতপা বলল, তুমি ভীরু বলেই ও-কথা বলছ। তোমার পথের কোন ক্ষতিই হয়নি। আমি তো আর তোমার সঙ্গে পালিয়ে

আসিনি যে তোমার এত লজ্জা। অনিল বলল, তুমিই বা কোন্ সাহস দেখিয়ে এসেছ। যদি সত্যিকারের সাহস তোমার থাকত তাহলে লুকিয়ে আসতে না, বলে কয়েই চলে আসতে—তাতে তোমার আমার দুজনের মানই থাকত।

আরো কিছুক্ষণ ধরে তাদের ঝগড়া চলল। এতদিন অতসীদের কাছে সুতপা যে কথা স্বীকার করেনি, এতদিন অনিল যে কথা সম্পূর্ণ গোপন করে গেছে সেই ঝগড়ার ভিতর দিয়ে তা বেরিয়ে পড়ল। অতসীদের কাছে সব ব্যাপার পরিষ্কার হয়ে গেল, বোধহয় ওদের নিজেদের কাছেও।

তবু ওদের সেই ঝগড়া সহজে মেটেনি। বরানগর ছেড়ে অনিল মানিকতলায় বাসা নিল। কিন্তু সুতপা তার কোন খোঁজ খবর নিল না, এবং দেখা-সাক্ষাৎ একেবারেই বন্ধ করে দিল।

এই সময় অতসীর সঙ্গে সুতপার দেখা হলে সুতপা প্রায়ই দার্শনিক আর আধ্যাত্মিক কথাবার্তা বলত। শুধু চাকরি করে সুতপা সন্তুষ্ট রইল না। এক গানের স্কুলে ভর্তি হয়ে সেতার শিখতে লাগল। সেতারে মন বসল না, ধরল গীটার।

তারপর অল্প কিছুদিন আগে খবর পাওয়া গেল অনিলের বিলাসপুরে বদলী হওয়ার অর্ডার এসেছে। মাসখানেকের মধ্যেই চলে যাচ্ছে সে সেখানে।

কাহিনীর এই জায়গায় এসে অতসী একবার সুতপার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসল, তারপর আমার দিকে চেয়ে বলল, এই কথা শুনে মেসোমশাই নিজে গিয়ে অনিলকে ডেকে এনে তার হাতে মেয়ে সম্প্রদানের ব্যবস্থা করেছেন। সুতপা নিজের গরজে কিছু করেনি।

আমি হেসে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার মেসোমশাই হঠাৎ এমন মত বদলালেন কেন?

অতসী বলল, 'ওঠ বাবা বেলা যায়।' বললাম, তার মানে?

অতসী হেসে বলল, লালাবাবুর সেই বৈরাগ্যের কারণ শোনেননি? ধোপার মেয়ের ডাক শুনে লালাবাবুর মনে বৈরাগ্যের আহ্বান এসেছিল। তিনি সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ঠিক ঐ ধরনের একটা ঘটনায় সূত্রপাত—বাবা সংসারের ডাক শুনলেন। মেয়ের অনুরাগ ও বৈরাগ্যের মানে বুঝলেন।

বললাম, কি রকম?

অতসী বলল, একদিন কোর্ট থেকে বাসে করে মেসোমশাই ফিরে আসছিলেন, মাঝ বয়সী এক ভদ্রমহিলার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। আর একটু পরেই চিনতে পারলেন তাঁরা দু'জনে পরিচিত। মহিলাটি এখন শ্যামবাজার স্কুলে টিচারি করেন। বিয়ে থা করেননি। আর করবেনও না। কারণ চুলে পাক ধরেছে। ডিস্‌পেপটিক রোগীর মত চেহারা। দেখলে মায়া হয়। মেসোমশাইর মনেও মায়া হল। তাঁকে ডেকে পাশে বসালেন। তারপর আলাপ করতে করতে যে স্টপেজে নামবার কথা সেটা ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে গেলেন। শোনা যায় এই মহিলারই নাকি আমাদের মাসীমা হওয়ার কথা ছিল।

মুখ টিপে একটু হাসল অতসী।

এবার সুতপা প্রতিবাদ করে উঠল, কি যা তা বলছিস। আমার নামে যা খুশি তাই বল। কিন্তু আমার বাবার নামে—। গুরুজন না তিনি? তারপর আমার দিকে সুতপা ফিরে তাকিয়ে বলল, ওর কথা বিশ্বাস করবেন না। কণামাসীমার সঙ্গে বাবার সে ধরনের কোন সম্পর্ক ছিল না। তা ছাড়া তখনকার দিনে,···আমি বললাম, তাই তো। তখনকার দিনে কি আর এখনকার মত সব হত।

অতসী আর রেখা হেসে উঠল। সুতপা হাসল না, শুধু বই নিয়ে মুখখানাকে আড়াল করে রাখল।

মাসের চতুর্থ সপ্তাহে ভারি টানাটানি পড়ল টাকার, সংবাদপত্রের ভাষায় প্রায় 'অচল অবস্থা'। কাঁচা বাজারের বরাদ্দ ছিল দিনে দেড় টাকা। আগের সপ্তাহ থেকেই কেটে ছেঁটে তাকে আঠের আনায় নামিয়ে এনেছিল প্রিয়তোষ, এবার একেবারে চৌদ্দ আনায় টেনে আনল। একবেলা আমিষ, একবেলা নিরামিষ এই চলছিল দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে। এবার মাছটি একেবারে ছাঁটাই করতে পারলেই ভালো হয়। কিন্তু কুন্তলার তাতে ঘোর আপত্তি। তাহ'লে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে খাওয়াও ছেলেমেয়েদের। আমি পারব না। দুধ নেই, ঘি নেই, দু'বেলা দু'টুকরো মাছ তাও যদি তোমার না সয়— ভারি ঝামেলা বিন্তু আর মিনুকে নিয়ে। মাছ ছাড়া একবেলাও চলবার জো নেই ওদের। নিজে কোন দিন মাছ খায়, কোন দিন খায় না কুন্তলা। নিজের ভাগের খণ্ডটুকু দ্বিখণ্ডিত ক'রে ছেলেমেয়ের নৈশ ভোজের জন্য তুলে রাখে। কিন্তু ঔদার্য প্রিয়তোষেরও কি কম। পাতে মাছের অর্ধেকটা তরকারি দিয়ে ঢেকে সেও রেখে যায় বাটির মধ্যে। দেখতে পেলে কুন্তলা ভারি রাগ করে।

দু'বেলা খাওয়ার পর দু'বেলা দু'টি সিগারেট খাওয়া প্রিয়তোষের বিলাস। মাসের শেষের দিকে এসে একটা কমায়। অফিস থেকে ফেরার সময় হাঁটে। পরিচিত কেউ সঙ্গে থাকলে বলে, পয়সা দিয়ে গাড়ীর ভিড় ঠেলার চাইতে বিনা পয়সায় রাস্তার ভিড় ঠেলা অনেক ভালো।

তবু এত কৃচ্ছ্রতা সত্ত্বেও মাসের শেষে অবস্থা অচল হয়ে পড়ল। মেয়ের অসুখে ওষুধে ডাক্তারে গোটা দশেক টাকা বেহিসেবী ব্যয় হয়ে গেছে। জ্বরটা খারাপের দিকেই যাচ্ছিল, সময় মত ডাক্তার না দেখালে আরো খরচান্ত হতে হতো।

সকাল বেলা বাজারের জন্য একটি টাকা হাতে দিয়ে কুন্তলা বলল 'এই কিন্তু শেষ সম্বল। যেভাবে পারো অফিস থেকে ফেরার সময় কিছু জোগাড় করে নিয়ে এস। নইলে কাল আর হাঁড়ি চড়বে না বলে দিচ্ছি।'

'না চড়ে না চড়ল।' জবাব দিল প্রিয়তোষ, তারপর একটু চুপ ক'রে থেকে স্ত্রীর আরও কাছে এসে গলা নামিয়ে প্রিয়তোষ ফিস ফিস ক'রে বলল, 'এবার চাওনা টাকাটা ওদের কাছে।' পাশের ঘরের দিকে আঙুল দেখিয়ে দিল প্রিয়তোষ।

কুন্তলা মুখ ঝামটা দিয়ে উঠল, 'ইস, বয়ে গেছে আমার, কেন, তোমার মুখ নেই, তুমি চাইতে পারো না, দাতাগিরি ফলাবার সময় মনে ছিল না তখন? এখন আদায়ের বেলায় বুঝি এই দন্তের ঝি? হাত পেতে নিলে ওরা যে হাত উপুড় করতে জানে না তাতো জানা কথা।' প্রিয়তোষ বলল, 'আঃ আস্তে, শুনতে পাবে।' কুন্তলা বলল, 'পায় তো পাক, অত ভয় কিসের, তবে যে বলেছিলে চাও গিয়ে টাকাটা, নিজের মান সম্মান খুব বাঁচাতে শিখেছ—আমার তো আব কোন মান সম্মান নেই।'

প্রিয়তোষ গম্ভীর মুখে বলল, 'আচ্ছা, বেশ, আমিই চাইব। তোমাকে চাইতে হবে না।'

আকারে ইঙ্গিতে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে প্রিয়তোষ আগেও বারকয়েক চেয়েছে। কিন্তু কি ক্ষিতীশ, কি তার স্ত্রী সর্বাণী কেউ যেন ইশারা বোঝেনা। অসাধারণ ওদের না বুঝবার ক্ষমতা, কিন্তু স্পষ্ট ভাষায় কি ক'রেই বা চাওয়া যায় টাকাটা, চাইলেও যে পাওয়া যাবেনা একথা ঠিক। অথচ মানটুকু খোয়াতে হবে।

দেওয়ার সময় অযাচিত ভাবেই টাকাটা প্রিয়তোষ ধার দিয়েছিল ক্ষিতীশকে, নিকটতম প্রতিবেশী ক্ষিতীশ। যাকে বলে 'পরবর্তী দরজার'। আর সে দরজা পাশের বাড়ির না, পাশের ঘরের।

দোতলায় বাড়িওয়ালা বিধুবাবু নিজে থাকেন সপরিবারে। একতলার ভাড়াটে ক্ষিতীশ আর প্রিয়তোষ। ছু'জনেরই একখানা ক'রে শোয়ার ঘর, একখানা রান্নার। এজমালী কল, চৌবাচ্চা, পায়খানা, ছাদ। একই দড়িতে ছুই পরিবারের ধুতি, পাঞ্জাবি, শাড়ি, শেমিজ, জামা প্যান্ট শুকোয়! একই সরু প্যাসেজটুকু দিয়ে লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে চটি পায়ে দিয়ে ছু'জনে বাজারে বেরোয়। বাঁ হাতে থলি, ডান হাতের ছু'টি আঙুল ঠোঁটের জ্বলন্ত বিড়িতে আটকা থাকে। রেশন আনবার দিন একই দোকানের সামনে একই সারিতে ছু' তিনটে থলি হাতে সপ্তাহে ঘন্টা দেড়েক ক'রে ছু'জনে দাঁড়ায়। সাড়ে ন'টার মধ্যে নাকে মুখে ভাত তরকারি গুঁজে ছু'জনেই ছুটতে ছুটতে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরে। কোন দিন ভিতরে ঢোকে, কোনদিন সারাটা পথই ঝুলতে ঝুলতে অফিসে গিয়ে পৌঁছায়। প্রিয়তোষ সরকার আর ক্ষিতীশ মজুমদার। জাতে একজন কায়স্থ আর একজন ব্রাহ্মণ। কিন্তু আভিজাত্যে ছু'জনেই সমান।

তবু ইদানিং একটু উনিশ বিশ শুরু হয়েছিল। ছু'তিন মাস ধ'রে অফিসের মাইনে নিয়ে ভারি গোলমাল হচ্ছিল ক্ষিতীশের। মাসিক বাড়ি ভাড়া, সাপ্তাহিক রেশনের দিন, প্রাত্যহিক বাজারের সময় যেমন নিয়ম বেঁধে আসছিল, অফিসের মাইনে তেমন নিয়ম মেনে চলছিল না। সাত তারিখে দিন ছিল মাইনের কিন্তু সরতে সরতে সাতাশে গিয়ে তিরিশ পেরিয়ে পরের মাসে গিয়ে পৌঁছতে শুরু করেছিল। কেবল তাই নয়। কোন মাসে মাইনের শতকরা ষাট ভাগ, কোন মাসে আধাআধি নিয়েও ফিরতে হচ্ছিল ক্ষিতীশকে, যে ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর একাউনট্যানটের কাজ করে ক্ষিতীশ, ব্যাঙ্ক ফেল, মন্দা বাজার, এবং ডিরেক্টরদের অব্যবসায়ী বুদ্ধির ফলে সে কোম্পানী উঠি উঠি করছিল। সব টের পেয়েও নানারকম চেষ্টা চরিত্র ক'রে ক্ষিতীশ ঠিক ছেড়ে যেতে পারছিল না।

সব খবরই কানে আসত প্রিয়তোষের। অবশ্য কানে যাতে না আসে পারতপক্ষে সেই চেষ্টাই করত। ব্যাঙ্কের বাঁধা মাইনের চাকবি। তিন বছর কাজের পর পঁচানব্বইতে দাঁড়িয়েছে। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অন্ন বস্ত্রের সমস্যায় নিজেই অস্থির। প্রতিবেশীর অভাব অভিযোগে চোখে ঠুলি আর কানে তুলো না গুজলে আত্মরক্ষার উপায় নেই। নিজেও তো এমন কিছু শান্তিতে নেই প্রিয়তোষ। তেল, কয়লার ব্যয় বাহুল্য নিয়ে স্ত্রীব সঙ্গে দু'চাব দিন বাদেবাদেই বচসা হয়। চিনি নিয়ে রাত দুপুরে স্বামী স্ত্রীব মধ্যে যে আলাপ চলে একেকদিন, তাব স্বাদ চিনির মত নয়। নৈশ দাম্পত্য আলাপ ইদানীং আদির চেয়ে বীর আর রুদ্ররসেই বেশী সরস হয়ে উঠে। পরের হাঁড়ির খবর রেখে লাভ নেই। তাতে নিজের হাঁড়ি ভাঙবার আশঙ্কা আছে। রাতদিন কেবল হিসাবেব ওপর চলে প্রিয়তোষ। অফিসে হিসেবের কাজ করতেও সেই হিসেবেব ফিসফিসানি।

তবু পূজার সময় ষষ্ঠীর দিন ভাবি একটা বেহিসেবী কাজ ক'রে বসল প্রিয়তোষ! পূজার বাজারে বেরুবার আগেই হিসেবটা ঠিকই রেখেছিল কিন্তু ফিরে এসে আর রাখতে পারল না।

গত বছর তবু এক মাসের বোনাস দিয়েছিল কোম্পানী, এবার মন্দা বাজারের দোহাই পেড়ে শুধু মাইনে দিয়েই হাত গুটিয়েছে। কিন্তু তাই বলে ছেলে মেয়ের পুজোর জামা জুতোব বেলায় তো আর হাত গুটিয়ে বসে থাকা যায় না। বিশেষ করে সাতদিন আগে থেকে রাতদিন খোঁচাবার জন্য যখন অগাধ অপত্যস্নেহ নিয়ে কুন্তলা রয়েছে ঘরে। ফর্দ তার আগে থেকেই তৈরী হয়ে আছে। বিন্তুর জন্য হাওয়াই শার্ট আর মুজাই জুতো। মিনুর জন্য সিল্কের ফ্রক। প্রিয়তোষ বলছিল, 'বেশ, তবে বিন্তু আর মিনুর মার জন্য কিন্তু এবার বিজন ঘরে নিশীথ রাতে আসব শুধু শূন্য হাতে।'

কুন্তলা ঠোঁট উল্টে বলেছিল, 'আচ্ছা আচ্ছা, শূন্য হাতকে কোন-দিন ভয় করেছি নাকি যে অত ভয় দেখাচ্ছ।'

বাজার করবার জন্য ছেলে মেয়েকে সঙ্গে নিয়েই বেরুল প্রিয়তোষ, মাস কয়েক আগে থেকেই দু' চার টাকা ক'রে যা জমিয়েছিল ব্যাঙ্ক থেকে তুলে পকেট পুরে এনেছিল আগের দিন। কুন্তলার যত বাক্স্ ট্রাঙ্ক কৌটা ঝাড়াঝাড়ি করেও মিলল গোটা পনের টাকা। সস্তার মধ্যে ছেলেমেয়েদের জামা হলো, জুতো হলো, কুন্তলার জন্য প্রথমে কিনল সাবান, স্নো, পাউডার তারপর ধাঁ করে পনের টাকা দিয়ে একখানা শাড়িই কিনে ফেলল। গঙ্গা জলে গঙ্গাপূজা সারা হলো এবারের মত। ট্রাম বাসে বড় ভিড়। মনের আনন্দে বউবাজারের মোড় থেকে একটা রিকশাই ডেকে ফেলল প্রিয়তোষ, প্যাকেটগুলি বগলে চেপে ছেলে মেয়ের দু' হাত ধরে রিকশায় টেনে তুলে নবাবী সুরে হুকুম দিল, 'চল তালপুকুর রোড, জলদি চল।' বিন্তু আর মিনুর মনেও ভারি ফুর্তি, দোকানেই দু'জনে বেশবাস বদলে ফেলেছে, বাড়ি আসা পর্যন্ত সবুর সয়নি। নতুন হাওয়াই শার্টের দিকে বিন্তু বাপের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলল, 'আমাকে খুব ভালো দেখাচ্ছে না বাবা?'

প্রিয়তোষ বলল, 'চমৎকার।'

মিনু বলল, 'আর আমাকে।'

প্রিয়তোষ বলল, 'অপূর্ব।' তারপর মৃদু হেসে সিগারেট ধরাল।

ঠুংঠুং ক'রে রিকশা চলছে।

বিন্তু আবার বলল, 'গোলাপী রঙই সবচেয়ে ভাল না বাবা?'

শার্টের গোলাপী রঙই পছন্দ হয়েছে বিন্তুর। প্রিয়তোষ হলদে রঙের একটা শার্ট তার জন্য বেছেছিল। বিন্তু আটবছরের কিন্তু মাথা নেড়ে নাকচ করেছে'—তুমি রঙ চেননা বাবা।'

শেষ পর্যন্ত বিন্তুর মতেই সায় দিয়েছে প্রিয়তোষ।

পুত্রাৎ শিষ্যাৎ পরাজয়েৎ।

ছেলের গোলাপী রঙের ঠোঁঠের দিকে তাকিয়ে প্রিয়তোষ আর একবার বলল, 'খুব ভালো, গোলাপী রঙের মত রঙ আছে নাকি সংসারে ?'

কিন্তু রঙটা বদলে গেল বাড়ির ভিতরে ঢুকে। দোরে রিকশা এসে থামবার সঙ্গে সঙ্গে নান্নু আর বান্নুও দৌড়ে এসেছিল। ক্ষিতীশের দুই ছেলে। বিন্তু মিন্নুর খেলার সঙ্গী। রিকশার কাছে দাঁড়িয়ে নান্নু বলল, 'কিরে নতুন জামাজুতো এল বুঝি তোদের ?'

বিন্তু সোল্লাসে বলল, 'হ্যাঁ ভাই। দেখেছিস জামার রঙ ? গোলাপী রঙই সবচেয়ে ভালো নারে নান্নু ? তোরা যখন জামা কিনতে যাবি এই রঙের জামা কিনতে বলিস কাকাবাবুকে, দোকানে এখনো আছে।'

নান্নু ম্লান মুখে বলল, 'থাকলে কি হবে। আমাদের জামা এবার আর আসবেনা। অফিস থেকে টাকা পায়নি কিনা বাবা, এই কান্নু, হ্যাঁ ক'রে দাঁড়িয়ে আছিস কেন অমন ক'রে আয় ঘরে আয়। গোলাপী রঙ আবার একটা রঙ নাকি। দূর, দূর।'

বিন্তুর চাইতে বছর দেড়েকের বড় নান্নু। বুদ্ধিতে পাকা। ছোট ভাইর হাত ধ'রে সে টেনে নিয়ে গেল ঘরে।

বিন্তু একটুকাল মুখ কালো ক'রে চুপ ক'রে রইল তারপর বলল, 'দেখলে বাবা, কি ভীষণ হিংসুটে নান্নুটা, ওদের নিজেদের জামা জুতো হবে না কিনা তা—'

মিন্নু মাথা নেড়ে বলল, 'না দাদা। তোর গোলাপী রঙটাই খারাপ, আমি তখনই বললুম—। কি বল বাবা, আমরা তো তখনই বলেছিলুম তাই না ?'

প্রিয়তোষ গম্ভীর মুখে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, হয়েছে, যাও এবার ঘরে, ঘরে যাও।'

খানিকক্ষণ আগেও নিজেকে মহাসুখী মনে হয়েছিল প্রিয়তোষের

এখন তার আর চিহ্নমাত্র রইলনা। না! নির্ভেজাল সুখ আর কপালে নেই মানুষের।

প্যাসেজটুকু পার হবার সময় কানে গেল ক্ষিতীশের স্ত্রী সর্বাণী শাসন করছে ছেলেদের, 'যেমন হ্যাংলা ঘরে জন্মেছিস, তেমন তো হবি। সাতজন্মেও দেখিনি বাপু তোদের মত ছেলে। জামাজুতো এর আগে কোন দিন পরোনি, না?'

কান্নাভরা গলা ভেসে এল নান্নুর, 'হুঁ, কত দিয়েছ জামাজুতো, পূজোর সময় সবাই জামা পরবে, জুতো পায়ে দেবে। বিন্তু মিনু সবাই। আর আমরা বুঝি—'

কান্নার আবেগে গলা বোধ হয় বুজে এল নান্নুর।

সর্বাণীর গলাও এবার অন্য রকম শোনা গেল, 'আমি কি করব। যেমন কপাল ক'রে এসেছিস, যেমন ঘরে জন্মেছিস তেমন তো হবে। নইলে পূজোগণ্ডার দিনে কতজনে কত সাধ আহ্লাদ ক'রে, আর আমার—।'

প্রিয়তোষ আব দাঁড়াল না। গম্ভীর মুখে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

ছেলে মেয়ের জামা জুতো, প্যাণ্ট আব নিজেব শাড়ি টয়লেট দেখে ততক্ষণে ভারি খুশী হয়ে উঠেছে কুন্তলা। স্বামীকে দেখে বলল, 'আহাহা, শাড়ি আবার কিনতে কে বলল তোমাকে। যা আছে তাতেই তো হতো। বাপেব বাড়ি থেকেই তো একখানা পাব। আবার কেন মিছামিছি—'

প্রিয়তোষ বলল, 'আচ্ছা, ক্ষিতীশ বাবু গেলেন কোথায়।'

কুন্তলা বলল, 'খানিকক্ষণ আগেও তো ঘরেই ছিলেন। সর্বাণীদির মুখের চোটে না থাকতে পেরে দাবায় গিয়ে বসলেন বোধ হয়। তোমাদেরও বলি, আচ্ছা কি ক'রে এ সময় তোমাদের দাবা খেলা আসে বল দেখি। ছেলে দুটো জামা জামা ক'রে কাঁদছে।'.

প্রিয়তোষ বলল, 'ওদের জন্য তোমার কি খুব দুঃখ হচ্ছে কুন্তলা?'

কুন্তলা বলল, 'আহাহা। ও কথা আবার জিজ্ঞাসা করে নাকি। ছেলে মেয়ে তো আমাদেরও হয়েছে। বুঝি তো সব।' মতলবটা আগেই ঠিক ক'রে রেখেছিল প্রিয়তোষ। এবার বলল, বোঝ যদি তাহলে এক কাজ করো। মাইনের টাকায় তো এখনও হাত পড়েনি। ওর থেকে গোটা পঁচিশেক টাকা আমাকে বের ক'রে দাও।

কুন্তলা স্বামীর চোখের দিকে এক পলক তাকিয়ে থেকে বলল, 'চেয়েছেন না কি ?'

প্রিয়তোষ বলল, 'চাইতে কি পারে ? তুমি আমি পারতাম ? যাদের আর কিছু নেই কুন্তী, অহংকারটুকু ছাড়লে তাদের আর বাকি থাকে কি।'

মুহূর্তকাল চুপ ক'রে থেকে বাক্স খুলে পাঁচ টাকার পাঁচখানা নোট বের ক'রে দিল স্বামীর হাতে। প্রিয়তোষ বলল, 'এক কাজ করো। গোপনে তুমিই দিয়ে এসনা ক্ষিতীশবাবুর স্ত্রীর হাতে।'

কুন্তলা বলল, 'না বাপু আমার লজ্জা করে। শেষে যদি কিছু মনে করে বসে।'

প্রিয়তোষ বলল. 'আচ্ছা তাহলে আমার কাছেই দাও।'

কুন্তলা বলল, 'খুব বলে কয়ে বুঝে শুনে দিও কিন্তু। মনে যেন কোন রকম দুঃখ না পায়।'

'সে তোমাকে বলতে হবে না।' বলে প্রিয়তোষ নোট ক'খানা হাতের মুঠির ভিতর লুকিয়ে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে। মনে মনে ভাবল মেয়েছেলের হাতে টাকা দেওয়াটা ভাল দেখাবে না। ক্ষিতীশ বাবুকেই খুঁজে বের করতে হবে।

কাছেই পাওয়া গেল ক্ষিতীশকে। সামনের গলির রোয়াকে বসে দাবা খেলছে বীরেন দাসের সঙ্গে। প্রিয়তোষ একপাশে গিয়ে দাঁড়াল।

বীরেন বলল, 'এই নাও কিস্তি। আর নড়ন চড়ন নেই। একেবারে

মোক্ষম। আজ হোল কি তোমার মজুমদার? বার বার তিন বার একেবারে গো হার হারলে। সাত দিনের মধ্যে আর মাছ মাংস মেয়ে মানুষ ছুঁয়োনা বুঝেছ?'

প্রিয়তোষ বলল, 'ক্ষিতীশবাবু, দয়া করে একবার আসবেন একটু।'

ক্ষিতীশ উঠে এসে বলল, 'ব্যাপার কি।'

প্রিয়তোষ বলল, 'চলুন কথা আছে।'

খানিক দূরে নিরালায় একটা নারকেল গাছেব আড়ালে ডেকে নিয়ে প্রিয়তোষ বলল, 'এই যে দেখুন, কিছু মনে করবেন না। এতদিন এক জায়গায় আছি। তা ছাড়া বলতে গেলে আপনি আমার বড় ভাইয়ের মত।'

ক্ষিতীশ একটু বিস্মিত হয়। দিন দুয়েক ধরে কথা বন্ধ দুই পরিবাবে। চৌবাচ্চার জল নিয়ে বিবাদ হয়েছিল সর্বাণী আব আর কুন্তলাব মধ্যে। সেই বিবাদ মীমাংসা করতে এসে নিজেরাই কথা কাটাকাটি শুরু করেছিল; ক্ষিতীশ আর প্রিয়োতোষ। শেষে কথা বন্ধ।

ক্ষিতীশ বলল, 'তা তো বটেই। বয়সে দু তিন বছরের বড়ই হব আপনার চাইতে। তাই কি।'

প্রিয়তোষ একটু ইতস্তত কবে বলল, 'তাই বলছিলাম কি, মানে আমাদের বিন্তু, মিন্নুও যা নান্নু কানুও তাই। ওদের জন্যেই যা ঝামেলা, নিজেদের জন্য কে এত মাথা ঘামায় মশাই। তাই বলছিলাম এই পঁচিশটা টাকা—'

মুঠি খুলে নোটগুলি এবাব এগিয়ে ধরল প্রিয়তোষ।

ক্ষিতীশ যেন একটু হক চকিয়ে গেল, 'টাকা দিয়ে কি হবে।'

প্রিয়তোষ বলল, 'কি আবার হবে মশাই। পঁচিশ টাকায় এখনকার দিনে কি হয় তা কি আর বুঝিনে? বাজার তো দেখে

এলুম স্বচক্ষে। ছেলেদের দুটো হাওয়াই শার্ট আপনি টাকা দশেকের মধ্যে পাবেন। আর বউদির জন্য—'

ক্ষিতীশ একবার নিঃশব্দে প্রিয়তোষের চোখে চোখে তাকাল। প্রিয়তোষ দেখে আশ্বস্ত হল, ক্রোধ দ্বেষের লেশ মাত্র নেই ক্ষিতীশের, চোখ দুটি কৃতজ্ঞতায় ছল ছল করছে।

ক্ষিতীশ বলল, 'কিন্তু—'

প্রিয়তোষ বলল, 'না, আপনার কোন কিন্তু টিন্তু আজ আর শুনব না দাদা। তা ছাড়া সঙ্কোচের কি আছে, ব্যাঙ্ক ট্যাঙ্ক খুললে মাইনের বাকিটা তো আপনিও পেয়ে যাবেন। কতদিন আর আটকে রাখতে পারবে। তখন দেবেন, এ মাসে না হয় ওমাসে; কোন সংকোচ করবেন না আপনি।'

নোট ক'খানা গুঁজে দিয়ে ক্ষিতীশের লোমশ হাতখানা নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরল প্রিয়তোষ, বলল, 'না করতে পারবেন না দাদা।'

সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত এক আনন্দ অনুভব .করল প্রিয়তোষ।

স্বল্পভাষী ক্ষিতীশ কৃতজ্ঞতা জানাতেও জানে না, কিন্তু চতুর্গুণে তার ক্ষতিপূরণ করল সর্বাণী আর নানু কানুরা। ঘণ্টা দুই বাদে নতুন হাওয়াই শার্ট গায়ে দিয়ে নানু কানু এসে দাঁড়াল প্রিয়তোষের সামনে, 'আমাদের জামা কেমন হয়েছে দেখুন কাকাবাবু।'

প্রিয়তোষ হেসে বলল, 'বেশ হয়েছে। কিন্তু তোমরা সবাই যে একেবারে গোলাপ গুলিয়ে এসেছ। ব্যাপারখানা কি ?'

নানু আর কানু একসঙ্গে হেসে উঠল, 'বাজারে যাওয়ার সময় বিস্তু আমাদের কানে কানে গোলাপী রঙের কথা বলে দিয়েছিল তা জানেন ?'

প্রিয়তোষ বলল, 'ও, তাই বুঝি। তা তোমরা সবাই তো রঙে রঙে একাকার হয়ে উঠলে, আর আমিই রইলাম কেবল বেরঙা মানুষ।

ছেলেরা সরে গেলে সর্বাণী এসে বলল, 'বিনয়ে আর দরকার নেই ঠাকুর-পো। খুব হয়েছে।'

প্রিয়তোষ বলল 'বিনয় আবার কোথায় দেখলেন। আলকাতরার গোলা গায়ে মেখে জন্মেছি, যে দেখে সেই বলে।'

সর্বাণী হেসে উঠল, 'কথা শোন। আহাহা কি আফসোস। বাইরে আলকাতরা হলে হবে কি, ভিতরে যে একেবারে সাত রঙের কারখানা বসিয়ে ছেড়েছেন। নইলে রসিয়ে রসিয়ে অমন ক'রে কি কেউ কথা বলতে পারে?'

কুন্তলা এসে বলল, 'বাজে কথায় আসল কথা লুকাও কেন বাণীদি, শাড়িখানা এনে দেখাও।'

'দেখাই ভাই, দেখাই! দুটো কথা বলছি তো অমনি হিংসে।'

তারপর প্রিয়তোষকে শাড়িও এনে দেখাল সর্বাণী। কেনা-কাটায় বেশ পটুতা আছে ক্ষিতীশের—এরই মধ্যে চওড়া খয়েরি পেড়ে মিলের শাড়িও একখানা কিনে এনেছে স্ত্রীর জন্য।

সর্বাণী বলল, 'দেখুন দেখি কি কাণ্ড মানুষের। আমার জন্য আবার এসব আনবার কি দরকার ছিল।'

খানিক বাদে এক কাপ চা নিয়ে এল সর্বাণী, 'দেখুন দেখি ঠাকুর পো, ঠিক মত চিনি হয়েছে নাকি?'

প্রিয়তোষ বলল, 'আপনার হাতের চা-ই যদি খেলাম, তাহলে চিনি দিয়ে খাব কেন। কিন্তু এই অসময়ে আবার চা।'

সর্বাণী বলল, 'এবার নিন। কত সময় অসময় মানেন আপনারা।' ব'লে, কি যেন এক গভীর অর্থ জ্ঞাপন ক'রে প্রিয়তোষের দিকে আড়চোখে তাকিয়ে মুখ মুচকে হাসল সর্বাণী।

টাকার কথাটা কেউ মুখ ফুটে বলল না। কিন্তু প্রিয়তোষের বুঝতে বাকী রইল না সর্বাণী সব জেনেছে। বুঝেছে, প্রিয়তোষের সৌজন্যে কৃতার্থ হয়েছে।

পুজোটা মিলে মিশে বেশ কাটল। পাড়ার মধ্যে সার্বজনীন দুর্গোৎসব তিন জায়গায়। ঘর গৃহস্থালী গুছিয়ে একসঙ্গে ঘুরে ঘুরে সবাই দেখে বেড়াল। ছেলে পুলে নিয়ে আগে আগে সর্বাণী আর কুন্তলা। পিছনে ক্ষিতীশ আর প্রিয়তোষ। বিজয়ার দিন কোলাকোলি করতে গিয়ে পরস্পরকে দু'জনে জড়িয়ে ধরল। সর্বাণী চা আর নিজের হাতের তৈরী লাড়ু এনে দিল প্রিয়তোষের হাতে। প্রিয়তোষ দোকান থেকে তিন টাকার খাবার আনিয়ে সর্বাণীদের আপ্যায়ন করল। কোজাগরী পূর্ণিমায় ঘর দোর ভ'রে লক্ষ্মীর পদচিহ্ন আঁকল সর্বাণী আর কুন্তলা। যার যার তার তার নয়। একজন আর একজনের। ছাদের ওপর নারকেল গাছের পাতায় পাতায় আকাশ থেকে জোৎস্না ঢলে পড়ল। ঘরের মধ্যে দাম্পত্য জীবনের গোপন কাহিনীর বিনিময় করতে গিয়ে গলাগলি ধ'রে হাসিতে ঢলে পড়ল দুই সখী।

কিন্তু তারপর শুরু হল কৃষ্ণপক্ষ। শোনা গেল ইতি মধ্যে অফিস থেকে মাইনের বাকি টাকাটা পেয়ে গেছে ক্ষিতীশ। ব্যাগে টাকা এল কি না এল, মানুষের বাজারের থলি দেখলেই তা বোঝা যায়। তিন টাকা ক'রে পোনা মাছের সের। প্রিয়তোষ ধারে ঘেঁষতে সাহস পেল না। দু' টাকা দরের চিংড়ি মাছ নিল একপো। কিন্তু আশ্চর্য, ক্ষিতীশ দিব্যি দেড়পো পোনা মাছ কানিতে বেঁধে থলির মধ্যে ফেলে দিল। উচিত নয় বুঝেও মনে মনে কেমন একটু ক্ষুণ্ণ হল প্রিয়তোষ। একসঙ্গে না পারে নাই পারল, গোটা দশেক টাকা অন্তত ক্ষিতীশ দিলেও পারত! কারো অবস্থাই তো কারো অজানা নেই। ঝোঁকের মাথায় পুজোর সময় বেশি খরচ ক'রে ফেলে বড় বেকাদায় পড়ে গেছে প্রিয়তোষ। অতটা না করলেও চলত। পরদিন দেখা গেল প্রিয়তোষের বেগুনের চাইতে ক্ষিতীশের বেগুন আকারে বেশ একটু বড়। বছরের নতুন আলুও আগে খেল ক্ষিতীশ।

কুন্তলা খবর দিল, 'জানো সর্বাণীদের আজ আধ সের গাওয়া ঘি রেখেছে। ছ'টাকা করে সের। ক্ষিতীশবাবুর জন দুই গায়ক বন্ধু এসেছিলেন। সর্বাণীদি বললেন শত হলেও তাঁদের তো আর দালদার লুচি খাওয়ানো যায় না।'

ঘুম পাচ্ছিল, প্রিয়তোষ শিউরে জেগে উঠল, 'গাওয়া ঘি! বল কি!' তারপরেই অবশ্য লজ্জিত হয়ে উত্তেজনাকে দমন করল প্রিয়তোষ।

কুন্তলা বলল, 'হ্যাঁ গো হ্যাঁ। তোমার মত বেকুব তো সবাই নয়। মাসের আগে ভাগে সব খরচ ক'রে—শেষে এখন মুখ শুকিয়ে থাকা। আধসের করে দালদা রাখতুম তাও তোমার সহ্য হল না। এদিকে শুকনো শুকনো রুটিতো বিস্তু, মিনু খেতে চায় না। চিনির বেলায়ও তো তুমি সমান কঞ্জুস।'

প্রিয়তোষ বলল, 'হু।'

আগে আগে সব খরচ হয়ে গেছে। কোন দফায় বেশী খরচ হলো তা মুখ ফুটে কি কুন্তলা কি প্রিয়তোষ কেউ কাউকে বলল না বটে কিন্তু অকথিত এবং ভদ্রলোকের অকথ্য সেই তথ্যটুকু মনের মধ্যে গরম তেলের মত ফুটতে লাগল।

ভাঁটার টান পাশের ঘরেও শুরু হয়েছিল। কথা তো মানুষ কেবল মুখ দিয়েই বলে না, চোখের চাউনি দিয়ে বলে, চলন দিয়ে বলে, এমন কি গায়ের গন্ধেও যেন মনের ঝাঁজ বের করে দিয়ে ছাড়ে। ক্ষিতীশের আর সর্বাণীর বুঝতে কিছুই বাকি ছিল না।

হাতের-তলায় মাথা রেখে ক্ষিতীশ অর্থচিন্তায় ব্যস্ত ছিল—সর্বাণী এসে পাশে দাঁড়াল, 'দেখ, আগে এসব জিনিস আমি বিশ্বাস করতাম না। এবার করতে হলো।' ক্ষিতীশ বিরক্ত হয়ে বলল, 'এ সব সে সব নয়, আমি সব জিনিসেই বিশ্বাস হারিয়েছি।' ভূমিকা ছেড়ে কি বলছিলে বল।'

ধমক খেয়ে সর্বাণী ঘাবড়ালো না। কি করে যেন টের পেল তার বিশ্বাস আর ক্ষিতীশেরর অবিশ্বাস মূলত এক। তার কথায় ক্ষিতীশ খুশী ছাড়া অখুশী হবে না। সর্বাণী স্বামীর আরো কাছে ঘেঁষে এসে অন্তরঙ্গ সুরে বলল, 'মা বলতেন মানুষের চোখেও বিষ থাকে। আগে বিশ্বাস করতুম না, এবার টের পেলুম সত্যি থাকে।'

ক্ষিতীশ অদ্ভুত একটু হাসল, 'থাকে নাকি? কি ক'রে টের পেলে?'

সর্বাণী বলল, 'সেদিন যখন ঘি রাখি না, কুন্তলা এমন আদেখলার মত চেয়ে ছিল যে তখনই বুঝেছিলুম কিছু একটা ঘটবে। সেই লুচি খাওয়ার পর থেকে নান্নুর কান্নুর দু'জনেরই পেটের অসুখ হয়েছে।'

ক্ষিতীশ বলল, 'ছিঃ, অসময়ে ওরা উপকার করেছে, সে কথা ভুলো না।'

মুখে বলল বটে কিন্তু বাজাব নিয়ে আসবার সময় প্রিয়তোষেব তাকাবার ভঙ্গিটা তার চোখের সামনে আর একবার ভেসে উঠল। আশ্চর্য, একটি কথা ছাড়া প্রিয়তোষের চোখে আর কোন কথা নেই। 'ক্ষিতীশ, তুমি পঁচিশ টাকা ধারো আমার কাছে। তা শোধ না দেওয়া পর্য্যন্ত তোমার একদিন একটু ভালো মাছ কিনবার অধিকাব নেই, নতুন তরকারি কিনবার অধিকার নেই। অধিকার নেই বিড়ির বদলে শখ ক'রে একটা সিগারেট ধরাবার, ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসে অত্যন্ত ভিড় দেখেও তোমার ক্ষমতা নেই ফার্স্ট ক্লাসের দিকে এগিয়ে যাওয়ার।'

না, মনের দুর্বলতায় প্রিয়তোষের কাছ থেকে ধারটা নিয়ে ফেলে ভারি বেয়াকুবিই করে ফেলেছে ক্ষিতীশ। এমন ক্ষুদ্র মহাজন নিয়ে অনুক্ষণ বাস করা অসম্ভব। ধারে কাছের কারো কাছ থেকে ধার করাটা এতদিন প্রিন্সিপলের বাইরে ছিল ক্ষিতীশের। এবার নীতিচ্যুতির মজাটা টের পাচ্ছে ক্রমশ।

সর্বাণী বলল, 'শুধু আকাশ পাতাল ভাবলে হবে না। ওদের দেনাটা এবার দিয়ে ফেল। এমন মাথা নিচু ক'রে থাকা দিনরাত ভালো লাগে না।'

ক্ষিতীশ বলল, 'দিলেই পারো। টাকাতো এনে তোমার কাছেই দিই।'

সর্বাণী বলল, 'আহাহা, কত টাকাই আনো বাক্স সিন্ধুক বোঝাই ক'রে। অফিস থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে চেয়ে চিন্তে যে দশ পনের টাকা আনো তাতো রেশন আর বাজারেই শেষ হয়ে যায়। একটি পয়সা এদিক ওদিক করবার জো থাকে নাকি তার থেকে যে দেনা শোধ দেবে ?'

সে কথা ঠিক, তবু টাকা হাতে এলে অন্তত দশটা টাকা প্রিয়তোষকে দেবার কথা না ভেবেছে তা নয়, না হয় এক সপ্তাহ বাজার নাই বা হলো। নুন ভাত খাক বউ ছেলেরা। বজায় থাকুক মান-সম্মান। কিন্তু কার্যত তা হয়ে ওঠেনি। তা ছাড়া আংশিক দেনা শোধের পদ্ধতিটাও মনঃপূত হয়নি ক্ষিতীশের। মাত্র পঁচিশটি তো টাকা। এক থোকে যেমন নিয়েছে, তেমনি এক থোকে ফিরিয়ে দিতে পারলেই মান থাকে। মাঝে মাঝে একথাও ক্ষিতীশ ভেবেছে যে অন্য কারো কাছ থেকে চেয়ে এনে প্রিয়তোষের টাকাটা পরিশোধ করে। কিন্তু নতুন কে এমন আছে যার কাছে হাত পাতবে। বরং সম্পর্ক বজায় রাখতে হলে পুরোন বন্ধুদের হাতেই কিছু কিছু টাকা এখন ফিরিয়ে দেওয়া দরকার। দু' একজন তো মুখ ফুটে তাগিদ দিতেই শুরু করেছে।

দ্বিতীয় মাসের তৃতীয় সপ্তাহে মুখ প্রিয়তোষদেরও ফুটল।

বাড়িওয়ালার স্ত্রী মন্দাকিনী আর কুন্তলা একসঙ্গে ঢুকেছে বাথরুমে। আলাপের আভাষ পেয়ে সর্বাণী দোরের বাইরে থমকে দাঁড়াল।

'চক্ষুলজ্জা বড় বালাই দিদি। ও জিনিসটা যারা চোখ থেকে ধুয়ে

মুছে ফেলতে পারে তাদের আর মার নেই।' ছেলেটার এত অসুখ গেল। ডাক্তারে ওষুধে কত খরচ। কেউ একবার শুধোল না দিদি, তোমরা কি দিয়ে কি করছ।'

পুজোয় কেনা ঠাণ্ডা গন্ধ তেলের কিছু অবশিষ্ট ছিল। সেইটুকু মাথায় মেখে গামছা হাতে স্নান করতে এসেছিল সর্বাণী। তেল-টুকুতে সর্বাঙ্গ শীতল হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু ব্রহ্মরন্ধ্র দিয়ে যেন আগুন ছুটতে লাগল।

কুন্তলা বেরিয়ে যাওয়ার পর সর্বাণী ঢুকল বাথরুমে। মন্দাকিনীর কাপড় কাচা তখনো শেষ হয়নি।

ছাদে ভিজে শাড়ি মেলতে যাওয়ার সময় সিঁড়ির গোড়ায় পা টিপে টিপে কান খাড়া ক'রে একবার দাঁড়াল কুন্তলা। সর্বাণীর গলার আভাষ পাওয়া যাচ্ছে, 'মানুষের জিভ তো মন্দাদি কেবল মিষ্টি তেতো চেখে দেখবার জন্যই তৈরী হয়নি। তার আরো গুণাগুণ আছে। সত্যি কথাটা জিভ দিয়ে যেমন সহজে বেরোয়, মিথ্যেটা তেমন বেরোয় না। জিভে আপনিই আটকে আটকে যায়। তা যাদের যায় না মন্দাদি, তারা বড় সুখী সংসারে, একটু থেমে দৃষ্টান্ত দিয়ে প্রাঞ্জল করল সর্বাণী, 'আচ্ছা, আপনারাও তো দেখেছেন দিদি, নিজের ঘর সংসার ফেলে দুপুরে দুপুরে দু'দিন গিয়ে বাতাস করেছি মেয়ের মাথার কাছে বসে। এই আক্রাগণ্ডার বাজারে একদিন বেদানা, আর একদিন কমলালেবু এনে দিয়েছেন উঁনি। তবু নাকি কেউ কাউকে শুধোয়না। এ বাজারে এর চেয়ে বেশী তত্ত্ব-তালাস করবার কার সাধ্য আছে বলুন তো।'

আড়ালে আবড়ালে এ সব চললেও তৃতীয় সপ্তাহে সামনা সামনি মৌখিক সৌজন্যটা মোটামুটি বজায় রইল। থলি হাতে প্রিয়তোষ বাজারে বেরুবার সময় উনোনের পাশে সর্বাণীকে দেখে জিজ্ঞেস করে, 'রাঁধতে বসে গেছেন বুঝি বউদি।'

সর্বাণী মুখে হাসি টেনেই জবাব দেয়, 'হ্যাঁ ভাই। বাজারের বেলা হয়ে গেল বুঝি আপনাদের ?'

কোন দিন সর্বাণী আগে ভদ্রতা করে, 'মূলোর জোড়া কত ক'রে আনলেন ঠাকুরপো ?'

প্রিয়তোষ স্মিত হাস্যেই বলতে চেষ্টা ক'রে, 'আর বলবেন না বউদি, এইতো এইটুকু এইটুকু মূলো, এরই জোড়া ছ' পয়সা। শুনলে সংসারের মূল সুদ্ধ উপড়ে ফেলতে ইচ্ছা করে।'

এখনও রস আছে প্রিয়তোষের কথায়। কিন্তু ঝাঁজটা যেন কেমন কেমন। হাসি আসতে চায়নি সর্বাণীর। তবু হাসতে হয়।

মুখোমুখি নিজেরাও সৌজন্য রাখতে চায় কুন্তলা আর সর্বাণী। কুন্তলা বলে, 'এসনা দিদি, পান খেয়ে যাও একটু।'

সর্বাণী ভারি মিষ্টি ক'রে জবাব দেয়, 'না ভাই পান ছেড়ে দিয়েছি। সে দিন চুনে ভারি মুখ পুড়ে গিয়েছিল '

কুন্তলা মনে মনে জ্বলে। হুঁ যত দোষ চুনের। মানুষের মুখের যেন আর কোন দোষ নেই।

বাসে ট্রামে দু'জনের দেখা হয়ে গেলে ভদ্রতা দেখাতে একেক দিন এখনও সাধ যায় প্রিয়তোষ আর ক্ষিতীশের।

প্রিয়তোষ হয়ত বলে, 'কণ্ডাক্টর দো টিকিট এক আনাওয়ালা।'

ক্ষিতীশ বাধা দিয়ে নিরস্ত করে, 'না না না প্রিয়তোষবাবু, আমিই নিচ্ছি।'

পঁচিশ টাকাই হজম করতে পারছোনা, এরপর আরো ?—

জোর ক'রেই দু'খানা টিকেট নিয়ে নেয় ক্ষিতীশ।

প্রিয়তোষ মনে মনে ভাবে, 'যাক, তবু এক আনা উশুল হলো।' কিন্তু পরদিন দু'জনকে বাসের দুই প্রান্তে দেখা যায়।

এমনি করে তৃতীয় সপ্তাহ কাটল। চতুর্থ সপ্তাহেরও পার হলো ছ' দিন। সপ্তম দিনে সংসারের দশম খবর শুনল প্রিয়তোষ।

একটি টাকা মাত্র সম্বল। মাসের শেষে কোথায় হাত পাততে যাবে প্রিয়তোষ? কেন পাতবে? পাওনাদার হয়ে কেন অন্যের কাছে দেনাদার হতে যাব? যেমন ক'রে পারুক ক্ষিতীশ জুটিয়ে আনুক টাকা। এ কর্তব্য তার। কেবল ধার দেওয়াই তো মানুষের কাজ নয়, প্রতিবেশীকে তার কর্তব্য স্মরণ করিয়ে দেওয়াও মনুষ্যোচিত।

কুন্তলাকে আর একবার আদেশের ভঙ্গিতে অনুরোধ করল প্রিয়তোষ, 'যাওনা একবার ঘুরিয়ে টুবিয়ে বলে দেখনা ক্ষিতীশবাবুর স্ত্রীকে। তোমাদের মেয়েতে মেয়েতে তো কত কথাই হয়। এতে আর দোষ কি।'

কুন্তলা বলল, 'ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলতে বাকি রেখেছি কিনা। বলতে হলে এখন একেবারে সোজাসুজিই বলতে হয়। তেমন বলা—যে যেচে টাকা দিয়েছিল সে বলুক গিয়ে। আমাব কোন দায় পড়েছে।'

প্রিয়তোষ দাঁত কিড় মিড় ক'বে বলল, 'আচ্ছা আমিই বলব।' তারপর চটির শব্দ করতে করতে গিয়ে দাঁড়াল ক্ষিতীশদের ঘরের সামনে।

'ক্ষিতীশবাবু আছেন নাকি, ও ক্ষিতীশবাবু?'

ছেলেরা খেলতে বেরিয়েছে গলিতে। সর্বাণীই আধখানা ঘোমটা টেনে শঙ্কিত ভাবে দোরের কাছে এসে দাঁড়াল। প্রিয়তোষের গলাটা মোটেই ভালো শোনাচ্ছেনা। সত্যি সত্যি মুখের ওপর আজ তাগিদ দিয়ে বসবে নাকি লোকটি। তাহলে তো একেবারে মাথা কাটা যাবে।

সর্বাণী যতদূর সাধ্য কণ্ঠে মাধুর্য এনে বলল, 'তিনি তো বাড়ি নেই ঠাকুরপো।'

'প্রিয়তোষ বলল, 'বাড়ি নেই মানে। দাবায় গিয়ে বসেছেন বুঝি?'

সর্বাণী আরও একটু হাসল, 'না দাবায়ও নয়। কলকাতার বাইরে গেছেন এক বন্ধুর কাছে।'

প্রিয়তোষ আর্তনাদের স্বরে বলল, 'বাইরে গেছেন!'

ঘোমটাটা ঠিক করতে গিয়ে একটু বুঝি উঠেই গেল। সর্বাণী তেমনি মধুর হাস্যে বলল, 'হ্যাঁ ঠাকুরপো একটু দরকারে বেরিয়েছেন। দিন দু'য়ের মধ্যেই ফিরবেন বলে গেছেন।'

প্রিয়তোষ মুহূর্তের জন্য স্তব্ধ হয়ে রইল। পাড়ার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দরী বউ সর্বাণী। দুই সন্তানের মা বলে বোঝা যায় না, এমন আঁটসাট গড়ন! হাসলে সর্বাণীকে চমৎকার মানায় কিন্তু এই মুহূর্তে তার হাসিতে সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে উঠল প্রিয়তোষের। মন তো তারে তারে বাঁধা। আগে থেকেই কি করে যেন টের পেয়েছে, তাই, না বলে কয়ে সরে পড়েছে ক্ষিতীশ। পাকা দাবারু এক চালে প্রিয়তোষকে মাত করে গেছে। কিন্তু মাত হয়ে ফিরবার ছেলে প্রিয়তোষ নয়। দাবা খেলতে সে জানে না। কিন্তু ছক উল্টে ফেলতে জানে। যারা নিজেরা শিষ্টাচারের ধার ধারে না, তাদের সঙ্গে ভদ্রতা রাখবার মত কাপুরুষতা নেই প্রিয়তোষের। সর্বাণীর দিকে আর একবার তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকাল প্রিয়তোষ। স্নান সেরে সদ্য পাটভাঙা শাড়ি পরেছে সর্বাণী! প্রিয়তোষের কাছ থেকে ধার করা টাকায় কেনা সেই চওড়া লাল পেড়ে শাড়ি। সেদিন ভারি ভালো লেগেছিল দেখে, সুন্দর মানিয়েছিল বলে মনে হয়েছিল, আজ সেই লাল পাড় দেখে রক্তের কথা মনে পড়ল।

সর্বাণী বলল, 'দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ঠাকুর পো, বসবার কিছু দেব?'

প্রিয়তোষ মাথা নাড়ল, 'না বউদি, মাফ করবেন, বসবার সময় নেই। হ্যাঁ উনি কবে ফিরবেন বললেন?'

প্রশ্নের ধরনে সর্বাণীর মুখের জোর করা হাসি এবার নিঃশেষে

মিলিয়ে গেল। মেয়েছেলে বলে বুঝি আর পরোয়া করবেনা প্রিয়তোষ। মুখের উপরেই বলে বসবে 'যে ভাবে পারো বের কর টাকা।'

কিন্তু আজ কোন ভাবেই যে পারেনা সর্বাণী।

প্রিয়তোষ আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কবে ফিরবেন বললেন ?'

সর্বাণী ঠিক একই জবাব দিল' 'দু দিন বাদেই ফিরবেন।'

সর্বাণীর গলা এবার যেন একটু শুকনো শুকনো, কাঁপা কাঁপা মনে হলো।

কিন্তু সেদিকে কোন ভ্রূক্ষেপ না করে প্রিয়তোষ বাঁকা বিদ্রূপে বলল, 'দু দিন—খুব লম্বা পাড়ি দিয়েছেন দেখছি। কিন্তু আমার যে তাঁকে আজই খুব দরকার ছিল বউদি।'

আর ভয় নেই সর্বাণীর। যা বলবার প্রিয়তোষ সব বলে ফেলেছে। লোকে এর চেয়ে বেশি স্পষ্ট করে বলবে কি।

সর্বাণীও এবার বিদ্রূপ ভঙ্গিতে হাসল, 'খুব দরকার যখন ছিল ভোরে এলেই পারতেন, তিনি তো আর লুকিয়ে যান নি, দিব্যি দিনের আলোয় রোদ উঠবার পরে বেরিয়েছেন।'

মুহূর্তকাল জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে থেকে ফিরে যেতে যেতে প্রিয়তোষ বলল, 'দিনেই যান আর রাতেই যান একই কথা। তা ছাড়া তিনি থাকলেই বা কি হতো।'

নিজের ঘরের দিকে কয়েক পা যখন প্রিয়তোষ এগিয়ে গেছে, সর্বাণী একটু উঁচু গলায় ডাকল, 'ঠাকুর পো একটু শুনে যান।'

এতক্ষণ কি যেন চিন্তা করছিল সর্বাণী, এবার যেন উপায় খুঁজে পেয়েছে।

প্রিয়তোষ ফিরে এসে বলল, 'বলুন।'

'আপনার কি খুবই দরকার।'

প্রিয়তোষ এবার একটু ঢোক গিলে বলল, 'হ্যাঁ মানে ক্ষিতীশ-বাবুকে দরকার।'

সর্বাণী একটু হাসল, 'কিন্তু তাকে তো আর পাচ্ছেন না। দয়া করে এটু কাজ ক'রে দেবেন?'

এর আগে বহু ফাই ফরমাশ খেটেছে প্রিয়তোষ। ক্ষিতীশের অনুপস্থিতে বাজার এনে দিয়েছে, রেশন এনেছে।

আজ বিরক্ত হয়ে বলল, 'কি।'

আঁচলের গিট খুলে গুণে গুণে তিনখানা হু'আনি প্রিয়তোষের হাতে দিল সর্বাণী, প্রিয়তোষের বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'একটা ফোন করবেন দয়া কবে। বিশ্বম্ভর মুখোপাধ্যায়ের নাম শুনেছেন বোধ হয়। সেক্রেটারিয়েটে বড় চাকরি করেন। তেতলা বাড়ি করেছেন বালিগঞ্জে। তিনি আমার আত্মীয়।' কথাটা সগর্বে বলল সর্বাণী। 'নম্বরটা গাইডেই পাবেন। আমার নাম ক'রে বলবেন, উনি বাড়ি নেই। তাঁকে আমার বিশেষ দরকার।'

ফোন করে দিল প্রিয়তোষ। এ ভাবে যদি কাজ উদ্ধার হয় মন্দ কি। টাকা নিয়ে কথা। যেমন ক'রে হোক পেলেই হলো। ফোনে সর্বাণীব জরুরী দরকারেব কথাটা একটু বিশেবভাবেই বলল প্রিয়তোব। ফোনে বিশ্বম্ভরবাবুর সম্মতি পাওয়া গেল, তিনি আসবেন বিকালের দিকে।

অফিস ছুটি। সাবা দিন প্রিয়তোব বাড়িতেই রইল। বেশ চাঞ্চল্য দেখা গেল সর্বাণীব ঘবে। নান্নু আব কানু দোকান থেকে কি কি সব নিয়ে এল। আনল আধ পোযাটাক খাঁটি ঘি, কিছু মসলা, গোটা তুয়েক ডিম। ডিমেব তৈরী জিনিস খুব ভালো খান বিশ্বম্ভর। সর্বাণী সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল। ডিম এ বাড়িতে কালে ভদ্রে আসে। কিন্তু বিশ্বম্ভরের ডিম না হলে একদিনও চলে না। বিশ্বম্ভরেব এই ডিম্বপ্রীতি, এই রোজ ডিম খাওয়াব ক্ষমতা, তা যেন সর্বাণীর নিজেরই, কেননা বিশ্বম্ভর সর্বাণীর আত্মীয়। প্রিয়তোষদের কেউ নয়।

না হলেও ডিম কেনার সময় প্রিয়তোষ নিজে একেকটা ডিম চোখের সামনে ধ'রে বেছে বেছে দিল সর্বাণীর দুই ছেলে নান্নু কান্নুকে। এটুকু ভদ্রতা করা যায়। বিশ্বম্ভর আসবার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে।

এ ঘরের জিনিস ওঘরে আদান প্রদান বন্ধ হয়ে ছিল। আজ আবার শুরু হলো। সর্বাণীই নিজে চেয়ে নিল কুন্তলাদের সব চেয়ে ভালো চায়ের কাপ আর প্লেট জোড়া। এটুকু চাইতে আর দোষ কি। এতো ঠিক চাওয়া নয়, চাওয়া চাওয়া ঠাট্টা। কয়েক ঘণ্টা বাদেই সমস্ত পাওনা ওদের আজ কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দেবে সর্বাণী। সে আর দেনাদার থাকবে না। চায়ের কাপ চাইতে এসে সেই কথাই সর্বাণী ঘোষণা করতে চাইল। বিশ্বম্ভর মুখুয্যের মত বড়লোক সর্বাণীর ঘরেই আসেন, কুন্তলাদের ঘরে না।

তা নাই বা এলেন, একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক তো আসছেন বাড়িতে। আর তাঁর আসবার বিশিষ্ট অর্থও আছে একটা। অমলেট মামলেট ছাড়া ডিমের আর একটা জিনিস তৈরী করতে জানে কুন্তলা— হালুয়া। তার কায়দাকানুন, মশলার ভাগ সর্বাণীকে সে বলে দিল। একখানা সাবান ছিল ঘরে। বাথরুম থেকে হাত পা মুখ ভালো ক'রে ধুয়ে নিল। বাকস খুলে বার করল পূজোর শাড়ি, ছেলেমেয়েদের জন্য জামা প্যান্ট বেরুল।

ঠিক একই রকম ঘটা পড়ে গেছে সর্বাণীর ঘরে। সাধ্যমত সেও সাজল, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ফিটফাট রাখল ঘরদোর। প্রিয়তোষের ঘরে চেয়ার আছে একখানা। বড় ছেলে নান্নু সেখানা বয়ে নিয়ে গেল।

সর্বাণী মনে মনে বলল, 'আহাহা চেয়ারের কি ছিরি দেখ।' বহুদিনের পুরোন চেয়ার। পালিস টালিস উঠে গেছে। ফাটলে ফাটলে বাসা বেঁধেছে ছারপোকা। কোন ভদ্রলোক এতে বসতে পারে?

ট্রাঙ্কের তলা থেকে কুমারী কালের বোনা ফুল তোলা আসনখানা বের ক'রে তার ওপর পেতে দিল সর্বাণী।

কুন্তলা তা দেখে স্বামীকে অন্তরালে বলল, 'আদিখ্যেতা দেখ একবার। কুটুম্ব স্বজন যেন আমাদের ঘরে আর কেউ আসেনা।'

প্রিয়তোষ বলল, 'করতে দাও, করতে দাও। আমাদের প্রাপ্যটা পেলেই হলো।'

কুন্তলা এক ফাঁকে জিজ্ঞেস করল, 'উনি তোমার কে হন দিদি।'

সর্বাণী সগর্বে বলল, 'জামাইবাবু।'

কুন্তলা তবু বলল, 'আপন ?'

সর্বাণী কুন্তলার চোখে চোখে তাকাল, 'আপন না হলেও আপনের বাড়া। ব্যবহারেই মানুষ আপন পর হয় ভাই। আপন পর কি আর গায়ে লেখা থাকে ?'

সম্পর্কটা একটু দূরেরই। পিসতুতো বোনের বর। সে পিসীও আপন পিসী নয়। তবু কিশোরী বয়সে সর্বাণীর ওপর ভারি মমতা ছিল বিশ্বম্ভরের। গাল টিপেছেন, বেণী টেনেছেন, হাতের নাগালে পেলে কিছুতেই আর ছাড়েন নি। বিয়ের পরেও দু'চারবার দেখা হয়েছে। ছেলের অন্নপ্রাশনে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। ক্ষিতীশ ওই এক ধরনের মানুষ। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে চলতে জানে না। তাহ'লে ভালো চাকরি বাকরিই হতো।

আশায় আশায় কাটল সারাদিন। তারপর রাত আটটায় গলির মোড়ে সশব্দে মোটর থামল। মোটর থেকে ডাক শোনা গেল বিলাতী কুকুরের।

সর্বাণী বলল, 'ঐ এলেন।'

সর্বাণীর ছোট ছেলে আর কুন্তলার মেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। জেগে আছে বড় দুটি। প্রিয়তোষের সঙ্গে তারাও এগিয়ে গেল মোটরের কাছে।

বিশ্বম্ভর প্রিয়তোষকে দেখে বললেন, 'আচ্ছা গোল মেলে নম্বর যা হোক। খুঁজে খুঁজে হয়রান। তেত্রিশের ডি কোন বাড়িটা বলতে পারেন মশাই।

প্রিয়তোষ সবিনয়ে বলল, 'এই যে আসুন আসুন, আমাদেরই বাড়ি।'

বিশ্বম্ভর ভ্রু কুঁচকালেন, 'আপনাদেরই বাড়ি মানে! সর্বাণীব কে হন আপনি। ক্ষিতীশের কোন ভাই টাই ছিল বলে তো জানতুম না।'

প্রিয়তোষ আমতা আমতা ক'রে বলল, 'না স্যার সে সব কিছু নয়, আমি পাশের ঘরের ভাড়াটে।'

বিশ্বম্ভর বললেন, 'ও, পাশের ঘরের। সিম্পাথেটিক নেবার, আই সি, আপনিই ফোন করেছিলেন?

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'বেশ বেশ, চলুন।'

ড্রাইভার চুপচাপ বসে আছে সীটে।

দোর খুলে বিশ্বম্ভর নেমে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে কুকুর ঘেউ ঘেউ ক'রে উঠল। নান্টু আর বিল্তুর মত প্রিয়তোষও সভয়ে পিছিয়ে গেল।

বিশ্বম্ভর মৃদু হাসলেন, 'আপনিও ছেলে মানুষ দেখছি। দেখছেন না বাঁধা আছে। অত ভয় কিসের। কুকুরের মাথায় সস্নেহে একটু চাপড় দিলেন বিশ্বম্ভর, 'Behave yourself Jack.' তারপর প্রিয়তোষের দিকে ফিরে বললেন, 'চলুন।'

বেশ লম্বা চওড়া স্বাস্থ্যবান চেহারা। মাথায় টাকের আভাষ আছে একটু। বয়স চল্লিশের কিছু ওপরে।

নান্টু আর বিল্তু পরস্পরের দিকে তাকাল। মোটরে চড়ে যিনি এলেন, তাঁর গায়েও হাওয়াই শার্ট। বেশ একটু আত্মীয়তা অনুভব

করল দুজনে। ওঁর শার্টের রঙটা অবশ্য একটু আলাদা। গোলাপী নয়, ধবধবে সাদা, খদ্দরের।

নান্নু ফিসফিস করে কিন্তু বেশ সগর্বে বলল, আমার মেসোমশাই।

বিন্তু বলল, 'তাহলে আমারও, নারে নান্নু। আমার বাবাও তো তোর কাকাবাবু।'

নান্নু একটু দাক্ষিণ্য দেখিয়ে বলল, 'আচ্ছা।'

খুব দীর্ঘ ঋজু চেহারা বিশ্বম্ভরের। মুখের সরু পাইপটাও বেশ ঋজু, একেবারে পার্পেণ্ডিকুলার ভাবে বসান।

খানিক এগিয়ে প্রিয়তোষ ব্যস্তভাবে বলল, 'মাথা নিচু করুন স্যার, নিচু করুন।'

বিশ্বম্ভর তাড়াতাড়ি মাথা নোয়ালেন। সদরটা ভারি নিচু। পেরিয়ে এসে বিরক্তমুখে বললেন, 'কি সব উল্টো প্যাটার্নের বাড়ী এ অঞ্চলে। ওটা ভেঙ্গে ফেলতে পারেন না?

প্রিয়তোষ বললেন, 'আজ্ঞে আমাদের তো নয়, বাড়িওয়ালার বাড়ি।'

'বাড়ি বলবেন না, বস্তী বলুন। এর চেয়ে বস্তীর ঘরগুলোও বেশ খটখটে, আলো হাওয়া আছে। স্বাস্থ্যকরও! কি যে সব কনভেনশন আপনাদের। আমি নিজের চোখে দেখছি দু'একটি বস্তী। ভাড়াও কম, থাকারও সুবিধে।'

সহানুভূতির আভাষ ফুটে উঠল বিশ্বম্ভরের গলায়। সর্বাণী এগিয়ে এসেছিল দোরের কাছে। শেষ কথাগুলো তার কানে গেল।

'আসুন জামাইবাবু। এত রাত হলো যে।'

'হ্যাঁ, মিনিস্টারের সঙ্গে একটা জরুরী এ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল, সেরে এলুম। তারপর খবর কি তোমার? সব ভালো? ক্ষিতীশ কোথায়?'

সর্বাণী মৃদু হাসি টেনে বলল, 'বাইরে গেছেন একটু দরকারে। আসুন, ভিতরে আসুন।'

'আবার ভিতরে।'

কাঁচা পায়খানা আর কাঁচা নর্দমার দুর্গন্ধ এখান থেকেই টের পাওয়া যাচ্ছে। পকেটের রুমালে একবার হাত দিলেন বিশ্বম্ভর। কিন্তু কি ভেবে তুলে নিয়ে নাকে চাপলেন না। বড় দৃষ্টিকটু দেখাবে। সর্বাণীরা মনে আঘাত পেতে পারে।

ভিতরে আসতে আসতে বিশ্বম্ভর সস্নেহে বললেন, 'একটু ভালো জায়গা দেখে নিতে পার না। ছেলেপুলের অসুখ বিসুখ হবে যে এখানে থাকলে।

সর্বাণী বলল, 'পাই কোথায়, দিন না খুঁজে।'

বিশ্বম্ভর বললেন, 'খোঁজবার মানুষ তো তোমার আছেই। তিল-মাত্র সময় নেই। রাত দিন এত ব্যস্ত থাকতে হয় যে বলবার নয়। তোমার ফোন পেয়ে মনে ভারি আনন্দ হলো। ঝোঁকের মাথায় কথা দিয়ে বললুম যাব। কিন্তু আসা কি সহজ।'

ঘরের মধ্যে চেয়ারে এসে বসলেন বিশ্বম্ভর। দোরের আড়ালে কুন্তলা এসে উঁকি দিল। ওধার থেকে নেমে এল মন্দাকিনীরা।

বিশ্বম্ভর বললেন, 'তোমার নাকি খুব জরুরী দরকার, ব্যাপার কি।'

সর্বাণী একবার দোরের দিকে তাকাল। প্রিয়তোষরা আশে পাশেই আছে। সর্বাণী বলল, 'বিশ্রাম করুন, পরে বলব!'

বিশ্বম্ভর একটু হাসলেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা। বড় খুশী হলুম। আগেকার দিনগুলির কথা মনে পড়ছে। ভারি শান্ত নির্বিরোধ ছিল জীবন। কোন ঝামেলা ঝঞ্ঝাট ছিল না।'

অতীত থেকে হঠাৎ বর্তমানে ফিরে এলেন বিশ্বম্ভর, 'আজ কিন্তু ভাই বেশী দেরি করতে পারব না, বড্ড তাড়া। শ্যামবাজার যেতে হবে একটু, সমীরণ ঘটকের ওখানে।'

সর্বাণী বলল, 'তিনি আবার কে?'

বিশ্বম্ভর বললেন, 'ঝানু আই. সি. এস। ভারি কূটকচালে বুদ্ধি। তবু খবর পাঠিয়েছে যখন একবার দেখা করতে হবে।'

বিশ্বম্ভর উঠে দাঁড়ালেন।

সর্বাণী ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'সে কি জামাইবাবু কতদিন পরে এলেন জল টল কিছু—'

বিশ্বম্ভর বললেন, 'আজ থাক। আজ বড় ব্যস্ত।'

সর্বাণী বলল, 'সে কি। ডিমের নতুন জিনিস করেছি আপনার জন্য। ডিমের প্রিপ্যারেশন কত ভালো খেতেন আপনি মনে আছে তো?'

'আছে।' কষ্টে একটু হাসলেন বিশ্বম্ভর, 'আচ্ছা আন।'

প্লেটে করে ডিমের প্রিপ্যারেশন গুলি নিয়ে এল সর্বাণী।

বিশ্বম্ভর একটু ছুঁলেন কি ছুঁলেন না, বললেন, 'অতয় কি হবে। আমাকে কি রাক্ষস ভেবেছ?'

'কিন্তু ডিম তো আপনি ভালোই খেতেন।'

'খেতাম। এখন আর বড় একটা খাইনে। ভারি গোলমাল চলেছে পেটের। দিনগুলি কি আর ফিরে আসে সর্বাণী। কেবল স্মৃতি থাকে, স্মৃতিই মধুর।'

কুন্তলার ঘর থেকে চেয়ে আনা চায়ের কাপেও একটু চুমুক দিলেন বিশ্বম্ভর। দিয়েই রেখে দিলেন। মুখবিকৃতিটুকু চোখ এড়াল না সর্বাণীর।

বিশ্বম্ভর হাতঘড়ি দেখে বললেন, 'ওরে বাবা, এরি মধ্যে আটটা পাঁচিশ। বড্ড দেরি হয়ে গেল। ঘটকের আবার সময়জ্ঞান টনটনে। উঠি ভাই।'

গলির মধ্যে মোটরকার পর্যন্ত তাঁকে এগিয়ে দিল সর্বাণী। সঙ্গে সঙ্গে গেল প্রিয়তোষ। শিষ্টাচার আছে তো। পিছনে পিছনে এল নানু আর বিন্তু। আর একবার ডাক শুনবে কুকুরের। একটু বেশী কাছে গিয়ে দাঁড়াবে। বাঁধাই তো আছে। ভয় কি।

ব্যস্তভাবে গাড়িতে উঠলেন বিশ্বম্ভর। ঘড়ি যেন দৌড়ে চলেছে আটটা সাতাশ।

ড্রাইভার স্টার্ট দিচ্ছে, হঠাৎ বিশ্বম্ভরের কি মনে পড়ে গেল। হাতে ইঙ্গিতে তাকে থামিয়ে, আর এক হাতের ইশারায় সর্বাণীকে ডেকে বললেন, 'ও সবু, শোন, শোন। ভারি অন্যায় হচ্ছিল ভাই, ভুলেই গিয়েছিলাম।'

সর্বাণী মৃদু কিন্তু দৃঢ় স্বরে বলল, 'কি জামাইবাবু।'

বিশ্বম্ভর মৃদু হাসলেন, 'আরে ভাই তোমার সেই দরকারের কথা—কিছু মনে করো না।'

বলে, ব্যাগ খুলে একখানা একশ টাকার নোট বার করলেন বিশ্বম্ভর, 'এই নাও। ক্ষিতীশকে একবার দেখা করতে বলে বুঝেছ?'

মনটা একেবারে কুঁকড়ে গেল সর্বাণীর। প্রিয়তোষ রয়েছে ড্রাইভার রয়েছে, সর্বাণী ঘাড় নেড়ে জানাল, বুঝেছি। কিন্তু গুটানো হাতখানা এগিয়ে দিল না, শুধু বলল, 'আজ থাক জামাইবাবু আপনার বুঝি আবার দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে বিশ্বম্ভর একবার সর্বাণীর দিকে তাকালেন, বললেন 'আচ্ছা তবে থাক।'

তারপর ইশারা করলেন ড্রাইভারকে। গাড়ি ছুটে চলল।

প্রিয়তোষ সর্বাণীর দিকে মুহূর্তকাল চেয়ে রইল, তারপর প্রসন্ন পরিতৃপ্তস্বরে বলল, 'চলুন বউদি।'

সর্বাণী বলল, 'হ্যাঁ, আসুন। ডিমের অতগুলি জিনিস একা খেলে পেটে সইবে না।' মৃদু হাসল সর্বাণী।

প্রিয়তোষও হাসল, 'একা খেতে আপনাকে দিচ্ছে কে।' পরমুহূর্তে প্রিয়তোষ, কুন্তলা আর ছেলেদের কলহাস্যে সর্বাণীর ঘর আবার মুখর হয়ে উঠল।

জামা

ভিড় ঠেলে বাস থেকে নামবার সময় কোনো এক অসাবধান সহযাত্রীর হাত লেগে কাঁধের কাছ দিয়ে জামাটা অনেকখানি ছিঁড়ে গেল যতীনের। রাস্তায় নেমে যাত্রীভরা বাসটার দিকে ফিরে তাকিয়ে যাকে সামনে দেখলো তাকে লক্ষ্য করেই যতীন অভিযোগের সুরে বলে উঠলো, 'দিলেন তো মশাই জামাটা ছিঁড়ে ? একটু দেখে শুনে চলতে পারেন না ?'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমাকে বলছেন কেন ? আমি ছিঁড়েছি ?'

তা ঠিক। তিনিই যে ছিঁড়েছেন একথা যতীন জোর দিয়ে বলতে পারবে না। সে তো নিজের চোখে কাউকে ছিঁড়তে দেখেনি। যতীন দ্বিতীয় কোনো কথা বলতে না বলতেই বাসটা ছেড়ে দিল। বাসের ভিতর থেকে বোধ হয় এই ব্যাপার নিয়েই কারো একটু হাসি, ক'জনের একটু কলগুঞ্জন যেন ভেসে এল। নিষ্ফল আক্রোশে বিমূঢ় ভাবে যতীন মুহূর্তকাল সেই চলন্ত বাসটার দিকে তাকিয়ে রইল। একটু আগে যারা ছিল সহযাত্রী তারা এখন সবাই শত্রু। সত্যি কাউকে দোষ দিতে পারে না যতীন। কাউকে সে ছিঁড়তে দেখেনি। যে অদৃশ্য নির্মম হাত তাকে দিনরাত টুক্‌রো টুক্‌রো করে ছিঁড়ছে সেই হাতই তার জামাটাকে অমন করে ফেঁড়ে দিয়ে চলে গেল।

মোড়ের ছোট্ট দোকানটিতে নীল রঙের লুঙ্গি পরা একটি আধবয়সী মুসলমান বিড়ির পাতা কাটছিল। সে যতীনের দিকে চেয়ে সহানুভূতির সুরে বললো, 'ভেবে আর কি করবেন মশাই। যখন যাবার তখন অমনিই যায়। আপনার জামাটা পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। নিন মশাই, বিড়ি নিন একটা।'

যতীনের দুঃখ দেখে, তার চেহারা দেখে বিড়িওয়ালার বোধ হয়

আরও একটু মমত্ব জেগেছে। বিড়িওয়ালার দানকে প্রত্যাখান করলো না যতীন। বিড়িটা হাত পেতে নিল। তারপর পকেটের সর্বশেষ দুটি পয়সা বের করে দিয়ে বললো, 'আরো গোটা কয়েক দাও সাহেব।'

সুরেশ সরকার রোড দিয়ে দক্ষিণ দিকে আরো দু'পা এগিয়ে বাঁ হাতে দেব লেনের মোড়ে এসে বিড়ি টানতে টানতে যতীন মিনিট খানেক দাঁড়িয়ে ভাবলো। সতীদের ওখানে যাবে কি যাবে না। এমন একটা ছেঁড়া জামা গায়ে দিয়ে কি কোনো ভদ্রলোকের বাড়ীতে ওঠা যায়। কিন্তু না গিয়েই বা উপায় কি। অন্তত গুটি-তিনেক টাকা না ধার করলেই আজ আর নয় যতীনের। মাসের শেষে সংসার একেবারে অচল হয়ে পড়েছে। এর মধ্যে আবার ছোট ছেলেটা টাইফয়েড থেকে ভুগে উঠলো। স্ত্রী ললিতা বলে দিয়েছে, 'যেমন করে পার অন্তত অর্ধেক রেশনের ব্যবস্থাটা করে এনো। নইলে ছেলেমেয়েগুলি সব শুকিয়ে মরবে। ঘরে একটা ক্ষুদও কিন্তু নেই।'

তাই সকালেই ধারের চেষ্টায় বেরিয়েছে যতীন। কাদাপাড়ায় কারো কাছে হাত পাতবার জো নেই। চেনা-পরিচিত যারা আছে সকলেই কিছু-না-কিছু পাবে। দেনা শোধ দিয়ে সাউকাবি বাখতে পারেনি যতীন। বাজারের যে ছোট্ট মুদি দোকানটায় যতীন কাজ করে, ছেলের অসুখের সময় সেখান থেকেও আগাম টাকা নিয়ে সে ভেঙেছে। চাইলেও নকড়ি নন্দী আর দেবে না। গাঁয়ের পরিচিত লোক যারা কলকাতায় আছে তাদের মধ্যে সতীদের অবস্থাই সব চেয়ে ভালো। তার স্বামী প্রফুল্ল বোসকে চাকরি করতে হয় না। বউবাজারে তার পৈতৃক ফার্নিচারের বড় দোকান আছে। দেব লেনে নিজেদের কেনা বাড়িতে তারা থাকে। ভাড়া দিতে হয় না। ধার করবার মতো এমন ভালো জায়গা যতীনের আর জানা নেই।

কিন্তু জায়গা ভালো হলেও কি এমন একটা ছেঁড়া জামা গায়ে

দিয়ে সেখানে ওঠা ভাল দেখায় ? শত হলেও গাঁয়ের জামাই। এক হিসেবে কুটুম্বের মতো। তবু না গিয়েই বা উপায় কি। খালি হাতে তো আজ আর বাসায় ফিরতে পারবে না যতীন। তা হ'লে ললিতা ঝাঁটা নিয়ে আসবে। কি কুক্ষণেই যে এই তেত্রিশ নম্বর বাসটায় আজ উঠতে গিয়েছিল যতীন। সে তো জানে এ বাসে সব সময় ভিড় থাকে। কত জনের পকেট কাটা যায়। কিন্তু যাওয়ার মতো পকেট তো আর তার নেই। তাই গোটা জামাটাই গেছে। কিন্তু বাসে আজ সাধ করে ওঠেনি যতীন। এই দুঃসময়ে চারটে পয়সা ইচ্ছা করে খরচ করেনি। গতকাল নিজের স্যাণ্ডেলটা ছিঁড়ে যাওয়ায় পাশের বাসার সুবল দাসের পামশুটা পায়ে দিয়ে বেরিয়েছিল যতীন। সুবল নিজেই বলেছিল, 'আজ আর আমি কোথাও বেরোব না, আমার শু-টা তুমি নিতে পার।'

কিন্তু সুবলের পা যে মেয়েদের মতো অত ছোট তা কি যতীন জানে। পরের জুতো তার পায়ে সয়নি। দুপায়ে ফোসকা পড়েছে। বাঁ পায়ের ফোসকাটা ফেটে গিয়ে এই একদিনের মধ্যেই ঘা হয়ে গেছে। এখন নিজের জুতোকেই পরের জুতো বলে মনে হয়। তবু এই জখমওয়ালা পা নিয়েই কাদাপাড়া থেকে শেয়ালদ' পর্যন্ত হেঁটে এসেছিল যতীন। তারপর শিয়ালদ'র মোড়ে এসে তেত্রিশ নম্বর বাসটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে কিরকম যেন লোভ লেগে গেল। ভাবলো পা-টাকে একটু আসান দেয়! কিন্তু পা-কে বাঁচাতে গিয়ে এমন অভাবিতভাবে জামাটা যে যাবে তা তো আর সে ধারণা করেনি। অথচ এই একটি মাত্র জামা-ই এখন সম্বল হয়েছে যতীনের।

নতুন চুনকাম করা সুন্দর দোতলা বাড়ি। কড়া নাড়তে গিয়ে যতীনের আঙুলের ডগায় দরজার একটু সবুজ কাঁচা রঙ লেগে গেল। একটু বাদেই সাবান মাখা মুখ নিয়ে প্রফুল্ল এসে দাঁড়ালো। বছর বত্রিশ তেত্রিশ বয়স প্রফুল্লর। যতীনের চেয়ে দু-তিন বছরের ছোট।

কিন্তু সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্য এমন টলমল করছে যে মনে হয় প্রফুল্ল এখনো যেন পঁচিশ ছাব্বিশ পার হয়নি।

'আরে আপনি! আসুন, আসুন।' প্রফুল্ল হাসিমুখে অভ্যর্থনা করলো। পরনে দামী লুঙ্গি, কাঁধে দুধের মতো সাদা টার্কিশ তোয়ালে, ভারি চমৎকার দেখাচ্ছে প্রফুল্লকে। যেন মহামান্য অতিথিকে আহ্বান করছে। এমন সৌজন্য, এমন বিনয়। নিজের বেশবাসের কথা ভেবে আব একবার ভারি কুণ্ঠা বোধ করলো যতীন।

ঘরের ভিতরে তাকে নিয়ে এসে প্রফুল্ল একটু উঁচু গলায় ডাক দিল, 'দেখ এসে সতী, কে এসেছেন।'

স্ত্রীকে সকলের সামনে আধুনিক কায়দায় নাম ধরেই ডাকে প্রফুল্ল। দোকানদার হলে কি হবে, এম, এ, পাস। আর কোনো চাকরির চেষ্টা না করে, বাপ মারা যাওয়ার পর নিজেদেব ব্যবসা দেখছে। কিন্তু দোকান আর বাড়ি-ঘরের চেহারা ধবন-ধারন এবং নিজেদের চালচলন আদব-কায়দা সব বদলে দিয়েছে প্রফুল্ল। সবাই যেন তার বাপের আমল থেকে তার আমলের পরিবর্তনটা বুঝতে পারে। যেন কেউ ধারণা না করে যে সে সরকারী চাকরি করে না বলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া শিক্ষাদীক্ষা রুচি-রীতি সব বিসর্জন দিয়েছে।

সতী রান্নাঘরে রাঁধুনীকে কি সব বুঝিয়ে দিচ্ছিল। স্বামীর ডাক শুনে ঘরে এসে দাঁড়ালো, বাইরের লোককে দেখে একটু আঁচল তুলে দিল মাথায়। তারপর যতীনকে চিনতে পেরে বললো, 'ও মা যতুদা তুমি! আমি ভাবলাম কে না কে, এ কি বেশ ধরে এসেছ।'

ঘরের মধ্যে ড্রেসিং টেবিলের পাশে দামী কাঁচ বসানো আলমারি। সেই আয়নায় নিজের চেহারাখানাও এবার চোখে পড়েছে যতীনের। রোগা হ্যাংলা চেহারা, দু-তিন দিনের জমানো একমুখ খোঁচা খোঁচা

দাড়ি, এরই মধ্যে দু-এক গাছ পাকতেও শুরু করেছে। পরনের কাপড়খানা আধময়লা। পায়ের স্যাণ্ডেল জোড়া দু'বছরের পুরোনো। ছেঁড়া জামাটা এই বেশের সঙ্গে বেশ মানিয়েছে। বরং ওটা আস্ত থাকলেই যেন কিছুটা বেমানান দেখাতো।

সতী আব একবার জিজ্ঞাসা করলো, 'করছ কি যতুদা ?'

যতীন একটু হাসতে চেষ্টা করে বললো, 'আর বলো না, বাসে আসতে আসতে এক ভদ্রলোক জামাটা এমন ভাবে টান মেরে ছিঁড়ে দিলেন—'

কথাটা শেষ কবার আগেই যতীন লক্ষ্য করলো স্বামী-স্ত্রী দু-জনে পরস্পরেব দিকে তাকিয়েছে। সত্যি, জামাটা এমনই জীর্ণ হয়েছে যে কেউ ওটাকে টান মেবে ছিঁড়েছে একথা লোককে বিশ্বাস কবানো শক্ত। সস্তা কাপড়েব একটা বঙীন শার্ট। হকারের কাছ থেকে হাসকা কেনা। এক বছরের ওপর এই একটি জামাকেই ব্যবহার কবছে যতীন। এ জামা স্বাভাবিক ভাবে ছেঁড়েনি, আর একজন টান মেবে ছিঁড়েছে, এ কথা লোকে যদি বিশ্বাস না করে তো দোষ দেওয়া যায় না।

প্রফুল্ল বললো, 'সত্যি, যা বলেছেন, ভিড়ের জন্যে আজকাল ট্রাম বাসে আর ওঠা যায় না। আমি বরং ট্যাক্সিতে—' স্ত্রীব চোখের ইশাবায় তাড়াতাড়ি থেমে গেল প্রফুল্ল।

সতী প্রসঙ্গ পাল্টে গদি আঁটা নবম চেয়ারটা যতীনকে দেখিয়ে দিয়ে বললো, 'বসুন যতুদা। তারপর বউদি ভালো আছেন ? ছেলে-মেয়েবা সব ভালো ?'

চেয়ারে বসলে সামনাসামনি আয়নাটা আর দেখা যায় না। তাই যতীন একটু সরে গিয়ে সতীর অনুরোধ রক্ষা করে বললো, 'ভালো আর কই। অসুখ বিসুখ লেগেই আছে। এই তো ছোট ছেলেটা মাসখানেক টাইফয়েডে ভুগে উঠলো। আমার কথা ছেড়ে দাও।

তোমরা সব কে কেমন আছ বলো। মেয়ে দুটি কই? তাদের দেখছিনে যে।'

সতী মৃদু হেসে বললো, 'স্কুলে গেছে যতুদা।'

যতীন বললো, 'বলো কি, ছোটটিকেও স্কুলে দিয়েছ? ওর বয়স তো বোধ হয় চার বছরও হয়নি।'

সতী তেমনি হেসে একটু কৈফিয়তের সুরে বললো, 'কিণ্ডারগার্টেনে ভর্তি করে দিয়েছি। স্কুলের গাড়ি এসে নিয়ে যায়। কি করবো বল, বাড়িতে বড় বিরক্ত করে।'

যতীনের মনে পড়লো নিজের ছেলেমেয়েগুলির কোনটিরই আজ পর্যন্ত পড়াশুনোর ব্যবস্থা করতে পারেনি। বড়টির বয়স তো বছর দশেক হলো। বাড়িতেই যা স্লেট পেনসিল নিয়ে এক আধ সময় বসে।

যতীন লক্ষ্য করলো প্রফুল্লর মতো সতীকেও বয়সের তুলনায় অনেক কম দেখায়। ওর যে আট বছরেব মেয়ে আছে তা মনেই হয় না। সতী দেখতে খুব সুন্দরী। সৌন্দর্যের জন্যেই ও এমন ধনী আর বিদ্বান বর পেয়েছে। বিয়ের পরও নিজের সৌন্দর্যকে, তারুণ্যকে কুমারী মেয়ের মতই সতী যেন বেঁধে রেখেছে। একটু মোটা হয়েছে এই যা। কিন্তু এইটুকু পুষ্টতা ধনীর ঘরের বউকে মানায়। পাশাপাশি নিজের স্ত্রীর চেহারাটাও একবার মনে পড়লো যতীনের। বয়সে ললিতা হয়ত সতীর চেয়ে দু-এক বছরের বড়। কিন্তু চার চারটি ছেলেমেয়ে হওয়ার পর ললিতার শরীর এমন ভেঙে পড়েছে যে সতীর প্রায় মা-র বয়সী মনে হয় তাকে।

স্ত্রীর মুখের সঙ্গে সঙ্গে কাজের কথাটা মনে পড়লো যতীনের। প্রফুল্লর দাড়ি কামানো শেষ হয়ে গিয়েছিল। তার দিকে চেয়ে বললো, 'ভাই প্রফুল্ল, গুটি তিনেক টাকা হবে? বড় ঠেকে পড়েছি।'

খুবই সামান্য প্রার্থনা। প্রফুল্ল একটু অপ্রতিভ ভাবে বললো,

'আচ্ছা আচ্ছা, সে দেখা যাবে। বসুন চা-টা খান। এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন।'

মুখ ধুয়ে এসে প্রফুল্ল আলনা থেকে জামাকাপড় নিয়ে পরতে শুরু করলো।

যতীন হেসে বললো, 'আমি ব্যস্ত হচ্ছি, না, তুমি ব্যস্ত হচ্ছ। এত তাড়াতাড়ি বেরোচ্ছ কোথায় ?'

প্রফুল্ল স্মিতমুখে বললো, 'একটু দরকারি কাজে বেরোতে হচ্ছে যতীনদা। মনে কিছু করবেন না। আপনার সঙ্গে বসে দুটো কথাও বলতে পারলাম না। কিন্তু আপনাদের আপন জন তো বাড়ীতেই রইলেন। কথা বলবার মানুষের অসুবিধা হবে না। সতী, শিব এসেছেন অন্নপূর্ণার কাছে ভিখারীর বেশে। তাকে কি দেবে না দেবে তুমিই জানো। আমরা নন্দীভৃঙ্গীর দল এবার পালাই।'

বলে, প্রফুল্ল হাসতে লাগলো।

সতী আরক্তমুখে বললো, 'শুনছ যতুদা ? মুখে কিছু আর আটকায় না।'

প্রফুল্ল এ কথার কোন জবাব না দিয়ে হাসিমুখে সিল্কের পাঞ্জাবিতে সোনার বোতাম আটকাতে লাগলো।

খানিক বাদে সে বেরিয়ে গেলে সতী বললো 'একটা সরকারী অফিসের কনট্রাক্ট পাওয়ার কথা আছে, তাই আর দেরি করতে পারলেন না। জানেন তো কম্পিটিশনের মার্কেট।'

যতীন বললো, 'তা তো ঠিকই।'

সতী বললো, 'বসুন এক্ষুনি আসছি।'

একটু আগে প্রফুল্ল ঠাট্টা করে গেছে সেই কথাটা ফের মনে পড়লো। তাই ভেবেই কি সতী তার সামনে একা একা বসে থাকতে লজ্জা পাচ্ছিল ? বড়ই মারাত্মক পরিহাস করেছে প্রফুল্ল। যতীনের ভিখারীর বেশটা মোটেই ছদ্মবেশ নয়, আসল বেশ, সেকথা জানে বলেই কি প্রফুল্ল অমন লাগসই ঠাট্টাটা করে গেল ? যতীন আর

সতী শুধু একই গাঁয়ের নয়, একই পাড়ার। ছেলেবেলায় খেলাচ্ছলে বরকনে সাজতো। রাধাকৃষ্ণ শিবতুর্গাও অনেকবার হয়েছে। হয়ত ছেলেবেলার সেই খেলার কথা স্বামীর কাছে গল্প করে থাকবে সতী। যতীনকে দেখে সেই কথাই মনে পড়ে গেল প্রফুল্লর। ছেলেবেলায় সতীর সঙ্গে সত্যিই খুব ভাব ছিল যতীনের। কতদিন যে স্কুল পালিয়ে সতীকে পেয়ারা পেড়ে দিয়েছে তার ঠিক নেই। ফল দেওয়ার বয়স পার হয়ে ফুল দেওয়ার বয়সে যখন যতীন এসে পৌঁছলো, সতীর মা বাবা সাবধান হয়ে গেলেন। কারণ তুই পরিবারের আর্থিক সামাজিক অবস্থার বড় বেশী তারতম্য। সতী কলকাতায় চলে এল। মামার বাসায় থেকে স্কুলে পড়বে, আর এদিকে বিয়ের সম্বন্ধের চেষ্টা চলবে। তার আগেই যতীনের বাবা মারা গেছেন। পাঁচ সাত বিঘা জমি যা ছিল দেনার দায়ে তা আগেই গিয়েছিল। থার্ড ক্লাসে বছর তুই ফেল করে পড়াটা তারও আগে ছেড়ে দিয়েছিল যতীন। কিন্তু সে যেন আর এক জন্মের কথা। এ জন্মে তখনকার সেই তুঃখ লজ্জা দাহ জ্বালা কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। নইলে কি তিনটে টাকা ধার চাইবার জন্যে সতীর স্বামী প্রফুল্লর কাছে আসতে পারে যতীন। সে-সব জন্ম-জন্মান্তরের কথা।

থালা ভরে লুচি আর হালুয়া নিয়ে এল সতী।

যতীন বললো, 'এই বুঝি চা?'

সতী হেসে বললো, 'এ চা হবে কেন, চা আসছে।'

চায়ের সরঞ্জাম আর একটি মেয়ে নিয়ে এল। দেখেই বুঝতে পারলো যতীন। বাড়ির ঝি। বছর চল্লিশ-বিয়াল্লিশের বিধবা। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। কালো ফিতে পেড়ে ধুতি পরনে। দেহের বাঁধুনি বেশ আঁটসাট।

সতী বললো, 'যাও বিমলা, তুমি রান্নাটা এবার দেখ গিয়ে। আমি একটু বাদেই আসছি।'

চা-টা নিজের হাতেই কাপে ঢেলে দিল সতী। তারপর আস্তে আস্তে বললো, 'ছেলেবেলার কথা সব মনে আছে যতুদা ?'

যতীন বললো, 'সব কি আর মনে থাকে ?'

সতী বললো, 'আমার কিন্তু আছে। সেই কাঁচা পেয়ারা আর কচি শসার স্বাদ জীবনে ভুলবো না।'

"বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে।" একটু আগে বিখ্যাত গ্রন্থকারের এই অতিবিখ্যাত লাইনটি মনে পড়ছিল যতীনের। কিন্তু এখন সতীর এই যত্ন দেখে, তার কথা শুনে যতীনের মনে হতে লাগলো সবটুকুই বুঝি অভিশাপ নয়।

এবেলাটা এখানে থেকে খেয়ে দেয়ে যাওয়ার জন্যে অনেক অনুরোধ করলো সতী, কিন্তু যতীন রাজী হলো না, তার অনেক কাজ আছে। এখান থেকে টাকা নিয়ে যাবে, তবে রেশন ধরবে। কথাটা সতীকে এবার নিঃসংকোচে বলেই ফেললো যতীন। সতী আর কোন পীড়াপীড়ি করলো না। আলমারি খুলে পাঁচ টাকার একখানা নোট বের করে দিল সতী।

যতীন বললো, 'আমার কাছে তো খুচরো নেই।'

সতী বললো, 'আহা নাও না, পরে দিলেই হবে।'

যতীন চলে যাচ্ছিল, সতী বললো, 'দাঁড়াও আর একটা কথা আছে।'

আলমারি থেকে বেছে বেছে মিহি খদ্দরের একটা পাঞ্জাবী বের করলো সতী। বললো, 'ওই ছেঁড়া জামাটা ফেলে দিয়ে এইটা পরে যাও। ওটা পরে কি ক'রে রাস্তা দিয়ে যাবে।'

মাত্র এইটুকু আদর। তাতেই যেন যতীনের চোখ দুটো ছলছল করে উঠতে চাইল। নিজেকে সংযত করে নিয়ে যতীন বললো, 'বাসায় আমার আরো জামা আছে সতী।'

সতী বললো, 'আমি কি বলছি যে নেই ? এটা দিচ্ছি রাস্তায়

পরবার জন্যে। নতুন জামা। আমার নিজের হাতের সেলাই। উনি মাত্র এক ধোপ পরেছেন। তারপর ধুয়ে এনে রেখে দিয়েছি। তোমার কোনো সংকোচের কারণ নেই।'

যতীন বললো, 'আমি সেজন্যে সংকোচ করছিনে।'

সতী বললো, 'তবে আর কি। গায়ে তোমার এক রকম করে মানিয়ে যাবে। লম্বায় তো তোমরা প্রায় দু-জনেই সমান।'

তিনটে সাদা বোতামও বের করে দিল সতী। যতীনকে অগত্যা জামাটা পরতেই হলো।

. সতী বললো, 'বোতামগুলো ভাল করে আটকে নাও। নাকি তাও আমাকে লাগিয়ে দিতে হবে?'

নিজের কথায় নিজেই লজ্জিত হয়ে পড়লো সতী। তারপর প্রসঙ্গ পাল্টাবার জন্যে তাড়াতাড়ি বললো, 'ভালো কথা, নৃপেন দত্তের মেয়ে রীতার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে জানো?'

নৃপেন দত্ত যতীনদেরই গাঁয়ের লোক। হাইকোর্টে প্রাক্‌টিস করে। ডিকসন লেনে বাসা। এখনো বাড়ি করেনি। কসবায় জায়গা কিনে রেখেছে। নৃপেনবাবুর ওখানেও যতীন মাঝে মাঝে যায়। কখনও চাকরির অনুরোধ করে, কখনও পাঁচ দশ টাকা ধার চায়।

যতীন বললো, 'হ্যাঁ, জানি। এই সাতাশে আষাঢ়ই তো বিয়ে। আর সপ্তাহ খানেক আছে। আমাকে বিশেষ করে যেতে বলেছেন। তোমরাও যাবে তো?'

সতী হেসে বলল, 'না গেলে কি আর ছাড়বেন? সব ফার্নিচার আমরাই দিচ্ছি। ওঁকে বলেছি বাজার দর থেকে কিছু সস্তা করে দিতে। চেনা জানা মানুষ।'

যতীন বললো, "তা তো ঠিকই। যাই এবার, অনেক বেলা হয়ে গেল।'

সতী বললো, 'আচ্ছা এসো। কিন্তু ওই ছেঁড়া জামাটা বগলে করে আবার নিয়ে যাচ্ছ কেন?'

যতীন বললো, 'নিয়ে যাই বাসায় কাজে লাগবে।'

সতী মৃদু হেসে বললো, 'বউদির আবার হবে টবে নাকি?'

যতীন বললো, 'না-না, সে-সব কিছু নয়।'

বাসায় এসে স্ত্রীর কাছে সবিস্তারে সতীর গল্প করলো যতীন।

ললিতা কোপের ভান করে বললো, 'সতী তো নয়, আমার সতীন। দিব্যি বসে খেলে, গল্প করলে, আবার জামাও পেলে একটা। তোমারই তো পোয়া বার, আমার কি!'

ছেঁড়া জামা আব ভালো জামা দুটোই তুলে রাখতে রাখতে ললিতা বললো, 'মন্দ হয়নি ব্যাপারটা। কাল আবার ওই ছেঁড়া জামা পরে আর এক সতীর কাছে যেয়ো। কিছু না কিছু মিলবে। এর আগেও তো সতীদের ওখানে গেছ। কই এমন যত্ন আত্তি তো করেনি। সব ওই ছেঁড়া জামার মাহাত্ম্য।'

যতীন বিড়ি ধরিয়ে হাসতে লাগলো।

বড় ছেলে মন্টুকে সঙ্গে করে রেশন নিয়ে এল যতীন। টাকাটাক খরচ করে বাজার করলো। দিনটা ভারি আনন্দে কাটলো। বস্তির ঘরখানা যেন হঠাৎ প্রাসাদ হয়ে উঠেছে। যে ছেলেমেয়েগুলিকে সর্বদা দূর দূর করে, আজ তাদের কাছে ডেকে আদর করলো যতীন। ঘরের দাওয়ায় রান্নার ব্যবস্থা। ছোট জলচৌকিখানা টেনে নিয়ে স্ত্রীর পিছনে বসে এটা ওটা নিয়ে খানিকক্ষণ স্ত্রীর সঙ্গে খোশ মেজাজে গল্প করলো।

ললিতা তরকারি রাঁধতে রাঁধতে একবার মুখ ফিরিয়ে বললো, 'আজ হলো কি তোমার বলো তো। কাজ কামাই করলে, বসে বসে কেবল গল্পই করছো। হয়েছে কি তোমার?' তারপর নিজেই একটু মুচকি হেসে বললো, 'কি যে হয়েছে, তা আমি জানি।'

পরদিন ভোরে উঠে সতীর দেওয়া জামাটা গায়ে দিয়ে কেবল বেরোতে যাবে যতীন, পাশের ঘর থেকে সুবল এসে হাজির, 'বাঃ নতুন জামা করলেন নাকি যতীন দা ?'

যতীন গম্ভীরভাবে বললো, 'হুঁ ।'

'কত পড়লো ?'

যতীন বললো, 'টাকা ছয়েক ।'

সুবল বললো, 'বেশ । তা হলে তো খুব সস্তাই হয়েছে ।'

আবো দিন পাঁচেক বাদে সুবল ফের এসে উপস্থিত। 'জামাটা এক বেলার জন্যে আমাকে ধাব দিতে হবে যে যতীনদা ।'

যতীন বিস্মিত হয়ে বললো, 'সে কি, এ জামা দিয়ে তুমি কি করবে ?'

সুবল বললো, 'হেস্টিংস স্ট্রিটে আমার একটা ইণ্টারভিউ আছে আজ দশটার সময়। কিন্তু ভালো একটা জামা নেই ঘবে। আপনার জামাটা দিতেই হবে ।'

আই, এ, পাস করে বছব তিনেক যাবৎ বেকার আছে ছোকরা। মাঝে মাঝে মবীয়া হয়ে চাকবিব চেষ্টা কবে। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়ে ওঠে না। গায়ের জামাটা যতীন ওকে আস্তে আস্তে খুলে দিল। খুব যে খুশী হয়ে দিল তা নয়। না দিলে চলে না বলেই দিল। পাড়াপড়শী মানুষ। এই সেদিনও ও স্বেচ্ছায় যতীনকে জুতো জোড়া ধার দিয়েছে। যতীনেব ছেলেদেব মাঝে মাঝে পড়াশুনো দেখিয়ে দেয়। বস্তিব ছেলেমেয়েদের জড়ো করে শখেব স্কুল খুলে বসে। কিন্তু সংসারের অভাব অনটনের মাত্রাটা বাড়লে সেই শখ আর বেশিদিন টেকে না। তা ছাড়া চাকরি-বাকরির ব্যাপার। মানুষের জীবনমরণ সমস্যা। এ সময় একটা জামা চাইলে মানুষ মানুষকে না দিয়ে পারে ?

জামাটা সঙ্গে সঙ্গেই গায়ে দিল সুবল। হেসে বললো, 'কেমন মানিয়েছে দেখুন তো।'

একটু আগে যতীনের মনে যে খুঁতখুঁতি ছিল সুবলের হাসি দেখে সেটুকু আর রইল না।

যতীনও হেসে বললো, 'হ্যাঁ, চমৎকার মানিয়েছে।'

নিজের প্রথম যৌবনের কথা মনে পড়লো যতীনের। ও বয়সে সবই মানায়। ও বয়সে তার সঙ্গেও সতীকে মানাতো।

যতীন বললো, 'জামাটা এই ক-দিনে আধময়লা হয়ে গেছে যে।'

সুবল বললো, 'তাতে কিছু হবে না। আমি এক্ষুনি সাবান দিয়ে কেচে শুকিয়ে নেব।'

সন্ধ্যার পর সুবল এসে খবর দিয়ে গেল, ইণ্টারভিউ খুব ভালো দিয়েছে। হেসে বললো, 'আপনার জামার গুণ আছে যতীনদা।'

জামাটা কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খুলে দিল না সুবল। যতীনের চাইতে লজ্জা করলো। ভাবলো কাল ভোরে চেয়ে নেবে। কাল নৃপেন দত্তের মেয়ের বিয়ের তারিখ। কাল তার জামাটা অবশ্যই চাই।

কিন্তু ভোরে উঠে সুবলের আর দেখা মিললো না। বাপের সঙ্গে ঝগড়া করে সে নাকি শেষরাত্রে যতীনের জামাটা গায়ে দিয়েই কাঁচড়াপাড়ায় কোন এক বন্ধুর বাড়ি চলে গেছে। চাকরি-বাকরি নিয়ে বাপ-মা দু-জনেই তাকে খোঁটা দিয়েছিলেন।

যতীন তো মাথায় হাত দিয়ে বসলো, আজ যে ওই জামা তার না হলে চলবেই না। আজ যে তাকে বিয়েয় যেতেই হবে।

স্বামী-স্ত্রী দু-জনে গিয়ে সুবলের বাপ-মার সঙ্গে ঝগড়া করে এল। এ কি রকম কাণ্ড তাদের ছেলের। পরের জামা নিয়ে দু-দিন ধরে আটকে রেখেছে। কোনো একটা দায়িত্ব নেই। এমন বে-আক্কেলে ছেলে কে কার বাপের জন্মে দেখেছে।

সুবলের বাবা মা দু-জনে ছেলের পক্ষ নিয়েই ঝগড়া করলেন। ধার তো সুবল কেবল একাই নেয় না। তার জুতো, ছাতা, ইস্তক

চার পয়সা দামের একখানা ব্লেড পর্যন্ত যতীন মাঝে মাঝে ধার নিয়ে দাড়ি কামায়। তার আবার অত খোঁটা কিসের।

মজা দেখবার জন্যে বস্তির লোকজন এসে ভিড় করছিল। স্ত্রীকে নিয়ে যতীন ঘরে ফিরে এল।

সুবল এই ফেবে এই ফেরে আশায় আশায় সারাদিন কাটালো যতীন। কিন্তু সুবল ফিরে এল না। সে কোন্ চুলোয় গেছে তার ঠিক কি।

যতীন আব একটা ভালো জামাব জন্যে সারা বস্তি খুঁজে বেড়ালো, পাড়ার লণ্ড্রিব মালিককে পর্যন্ত দু আনা কবুল করলো, তবু বিয়ে-বাড়িতে যাওয়াব মতো একটা জামা জোটাতে পারল না।

লণ্ড্রিব হীরেন সবকাব বললো, 'না ভাই তোমাদের বস্তির লোককে দিয়ে বিশ্বাস নেই। আমার অনেক শিক্ষা হয়ে গেছে।'

বিয়ে বাড়ির নিমন্ত্রণে যাবে কি যাবে না বসে বসে খানিকক্ষণ ভাবলো যতীন।

ললিতা বললো, 'না যাওয়া কি ভালো দেখাবে। নৃপেনবাবু তোমাকে নিজের মুখে বলেছেন। না গেলে তিনি নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন। সময়ে অসময়ে তাঁর কাছে তো গিয়ে হাত পাততে হয়। আমি তো বলি যাও গিয়ে।'

যতীন বললো, 'যাব যে, কি পবে যাব।'

হাতে কাচা একখানা ধুতি আব সেই ছিটের শার্টটা বেব কবলো ললিতা, বিকেলের মধ্যে সেলাই কবে কেচে শুকিয়ে ঠিক করে রেখেছে। সামনের দিকে দু-তিন জায়গায় ফুটো হয়ে গিয়েছিল। নিজের হাতে বিপু করে দিয়েছে ললিতা। তবু জামাটাব জীর্ণতা ঢাকা পড়েনি। বিশেষ করে কাঁধের কাছে আর পিঠের কাছে ধারা সেলাইটা বড় স্পষ্ট চোখে পড়ে।

যতীন একটু বসে কি চিন্তা করে বললো, 'আচ্ছা দাও, ওইটা পরেই যাই।'

ললিতা বললো, 'তাতে কোনো ক্ষতি হবে না। তুমি তো আর বরযাত্রী সেজে যাচ্ছ না, কনে পক্ষের লোক হিসেবেই যাচ্ছ। তোমার আবার অত সাজগোজের কি দরকার।'

স্ত্রীর যুক্তি দেখে যতীন হেসে বললো, 'তা ঠিক।'

ছোট দুটি ছেলে মেয়ে নিমু আর টেপি এসে যতীনকে জড়িয়ে ধরলো, 'বাবা আমাদের নেমন্তন্নে নিয়ে যাবে না?'

যতীন একটু অপ্রস্তুত হলো—নৃপেনবাবু আর কাউকে বলেন নি।

এ তো গাঁয়ের বাড়ি নয়, কলকাতা। গোনা গাঁথা মানুষের ব্যা [illegible] । [illegible]বনা নিমন্ত্রণে কি কাউকে নিয়ে যাওয়া যায়।

যতীন ছেলে-মেয়েদের আশ্বাস দিয়ে বললো, 'তোমাদের আর একদিন নিয়ে যাব।'

ললিতা তাদের ধমক দিয়ে সরিয়ে নিয়ে গেল।

আজ আর হেঁটে গেল না যতীন। ছ'টি পয়সা ভাড়া দিয়ে কাদাপাড়া থেকেই বাসে উঠে বসলো। ললিতা ঠিকই বলেছে, সে তো কনেপক্ষ। তার জামা কাপড়ের অত বাহার না হলেও চলবে। গিয়েই জামা আর গেঞ্জি দুই-ই খুলে ফেলবে যতীন। হ্যাঁ, গেঞ্জিটাও খুলে ফেলতে হবে। জামার মতো ওটাও বড্ড বেশি ছেঁড়া। বিয়ে বাড়িতে গিয়ে দুটোই খুলে ফেলে ভাঁড়ারে গিয়ে একেবারে মিষ্টির বালতি হাতে নেবে যতীন। কোমরে গামছা জড়িয়ে নেবে। নৃপেনবাবু দেখে খুশী হবেন। আর বাইরের লোকে তাকে ভাববে দত্তদেরই আত্মীয়।

বাসটা আরো খানিক দূর এগিয়ে যেতে আলো-ঝলমল আর একটি বিয়ে বাড়ি চোখে পড়লো যতীনের। ব্যতিব্যস্ত একটি সুন্দরী সুসজ্জিতা বধূকে দেখা গেল জানলা দিয়ে। অনেকটা সতীর মতো। যতীনের মনে পড়লো এই বিয়েতে সতীও আসবে। আর সঙ্গে সঙ্গে মনটা অকারণ অপূর্ব আনন্দে ভরে উঠলো যতীনের। সে

নৃপেন দত্তের বাড়িতে আসবে না, সে যাচ্ছে যেখানে সতী আসবে সেইখানে। এ পর্যন্ত কোনো বিয়ে-বাড়িতে সতীকে দেখা যতীনের ভাগ্যে হয়ে ওঠেনি। সতীর বিয়ে কলকাতায় হয়, তখন সে ছিল দেশে। আর যতীনের নিজের বিয়ে হয় গাঁয়ের বাড়িতে, তখন সতী ছিল কলকাতায়। অন্য কোনো বিয়ের আসরেও তারা দু-জন এক সঙ্গে উপস্থিত থাকেনি। আজ এই প্রথম থাকবে। সারা মনে এক অদ্ভুত আনন্দ আর উল্লাস অনুভব করল যতীন। তার বয়স যেন দশ বছর কমে গেছে। নতুন তারুণ্যের জোয়ার এসেছে দেহে মনে।

কিন্তু বিয়ে বাড়ির সামনে এসে যতীন যেন একটু বিমূঢ় হয়ে গেল। পূবে পশ্চিমে দুদিকে মোটর গাড়ির সার। ভিতরে উজ্জ্বল আলো, লোকজন, হৈ চৈ। মেরাপ বাঁধা ছাতে বরযাত্রীদের বৈঠক বসেছে। লুচির ঝাঁকা, মাংসের বালতি, সন্দেশের থালা হাতে পরিবেশকের দল সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, নামছে, ছুটছে, থামছে। কারো চোখে চশমা, কারো হাতে সোনার ঘড়ি।

ঘুরতে ঘুরতে নৃপেনবাবুর সঙ্গেই দেখা হয়ে গেল যতীনের। আজ আর পরনে কোট প্যান্ট নেই। খাটো ধুতি, গায়ে সাদা হাফ শার্ট, খালি পা, মাথায় টাক, পঞ্চাশ বছরের প্রৌঢ় বাঙালী ভদ্রলোক—বিনয়নম্র কনের বাপ।

যতীনকে দেখে স্মিতমুখে বললেন, 'এই যে যতু এসেছ। বসো বসো। আরে পাত পেতে এক জায়গায় বসে যাও না কেন। নিজেদের বাড়িতে এসেছ। ওহে যতুকে তোমরা কোথাও বসিয়ে দাও না।'

নৃপেনবাবু কাদের উদ্দেশে যে কথাটা বললেন ঠিক বোঝা গেল না। কারণ ধারে কাছে পরিবেশনকারী ছেলেরা কেউ ছিল না।

যতীন একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো, 'আমার বসবার জন্যে কি হয়েছে। আমি তো বাড়ির লোক।'

নৃপেনবাবু বললেন, 'বেশ তা হলে পরে বসবে।'

বলে, চলে যাচ্ছিলেন, যতীন তাকে তাড়াতাড়ি ডেকে থামালো।

'আর একটি কথা। প্রফুল্লবাবুরা কি এসেছেন?'

'কোন্ প্রফুল্লবাবু?' নৃপেনবাবু একটু ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন।

'আজ্ঞে ওই যে বউবাজারে ফার্নিচারের দোকান আছে।'

'ও হ্যাঁ, তাঁরা এসেছেন।'

'তাঁর স্ত্রী—'

বেশ একটু লজ্জিত ভঙ্গিতেই কথাটা উচ্চারণ করলো যতীন।

নৃপেনবাবু বললেন, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, স্ত্রী ছেলেমেয়ে সব এসেছে।'

ব্যস্ত ভাবে তিনি কোথায় চলে গেলেন।

যাক, সতী তা হলে এসেছে। মনটা ফের উৎফুল্ল হয়ে উঠলো যতীনের। কিন্তু কি ক'রে তার সঙ্গে দেখা করা যায়। এই প্রমীলা-মহল থেকে কি করে খুঁজে তাকে বের করবে যতীন। এই নিষিদ্ধ দুর্গে সে ঢুকবে কি করে। শুধু বরযাত্রীদের পরিত্যক্ত বাইরের ঘরখানা ছাড়া কোথাও তার যাওয়ার জো নেই।

প্রথমে দু-একটি ছেলেকে হাতের ইশারায় ডাকলো যতীন। কিন্তু তারা কেউ কাছে এগোলো না।

অবশেষে ফ্রক পরা আট ন-বছরের একটি মেয়েকে দেখতে পেয়ে যতীন তার কাছে গিয়ে বললো, 'খুকি একটা কথা শুনবে?'

'বলুন।'

'প্রফুল্লবাবুর স্ত্রী সতী দেবী, সতী বসু কোন ঘরে আছেন তুমি জানো? তুমি তাঁকে একটু ডেকে দিতে পারবে?'

মেয়েটি বললো, 'ও আপনি সতী মাসীর কথা বলছেন? খুব পারবো, আপনি আমার সঙ্গে আসুন।'

যতীন একটু ইতস্তত করে বললো, 'আমি বরং এখানে দাঁড়াই।'

মেয়েটি হেসে বললো, 'আপনি ভয় পাচ্ছেন কেন? আসুন না,

আমি আপনাকে চিনিয়ে নিয়ে যাব। ওঁরা সব দোতলায় আছেন। দিদিকে যেখানে সাজাচ্ছে, সেইখানে।'

যতীন আর কোনো দিকে না তাকিয়ে মেয়েটির পিছনে পিছনে দোতলায় উঠে এল। তারপর একটা সরু লম্বা বারান্দায় অপেক্ষাকৃত একটু নির্জন জায়গায় তাকে দাঁড় করিয়ে মেয়েটি বললো, 'আপনি এখানে অপেক্ষা করুন। আমি ওঁকে ডেকে দিচ্ছি।'

একটু বাদে সতী এসে দাঁড়ালো, একেবারে রাজরাজেশ্বরীর মূর্তি। পরনে দামী বেনারসী। সারা গায়ে গয়না। মাথায় আঁচল নেই, সুন্দর পরিপাটি করে বাঁধা খোঁপা। সিঁথিতে সিঁদুরের আভাস, আছে কি নেই বোঝা যায় না। সতী নিজেই যেন এ বাড়ির বিয়ের কনে। মুগ্ধ বিস্মিত চোখে যতীন মুহূর্তকাল তার দিকে তাকিয়ে রইল। আর যেন কিছু আজ বলবার নেই। সে তো কিছু আজ চাইতে আসেনি, শুধু চেয়ে থাকতে এসেছে।

যতীনকে দেখে সতী একটু বিস্মিত হলো, বললো, 'তুমি! আমি ভাবলাম বুঝি—'

যতীন হেসে পাদপূরণ করে বললো 'কে না কে!'

সতী বললো, 'না, ঠিক তা নয়।'

তারপর যতীনের গায়ের জামাটার দিকে চোখ পড়তেই বলে উঠলো, 'ও কি তুমি ফের সেই ছেঁড়া শার্টটা প'রে এসেছ যে পাঞ্জাবিটা কি হলো?

নিজের ছেঁড়া জামার কথা এতক্ষণে যতীনের খেয়াল হলো। জামাটার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে লজ্জিতভাবে কৈফিয়তের সুরে বললো, 'আর বলো না। চাকরির ইন্টারভিউ দেবে বলে পাশের বাড়ির এক নাছোড়বান্দা ছোকরা জামাটা নিয়ে গেছে। এমন করে ধরলো যে না দিয়ে পারলাম না।'

সতী স্থির দৃষ্টিতে যতীনের দিকে একটুকাল তাকিয়ে রইল।

মুখের ভাব একটু যেন কঠিন হলো। কিন্তু সেলাই করা জামাটার দিকে আর একবার তার চোখ পড়তেই সতীর ঠোঁটে ফের একটু হাসি ফুটে উঠলো।

সতী চপল কৌতুক মেশানো সুরে বললো, 'আচ্ছা আচ্ছা সে গল্প আর একদিন শুনবো। আজ বড় ব্যস্ত আছি। ওঁদের এখনো মেয়ে সাজানো হয়নি। যাই।'

লীলায়িত ভঙ্গিতে সতী পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। একটু বাদে একদল তরুণীর খিল খিল হাসির শব্দ শোনা গেল।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যতীন। তারপর দ্রুত পায়ে নিচে নেমে এল। ভিড়ের সঙ্গে মিশে সেই আলোর মালায় সাজানো বিয়ে বাড়ির ফটক পার হয়ে গেল। সতীর কথা, সতীর হাসি সহস্র বিষাক্ত সূচের মতো যতীনকে এবার বিদ্ধ করতে লাগলো। সতী তার কথা বিশ্বাস করেনি। সেই প্রথম দিনও না, আজও না। ওরা দান করে, দয়া করে, কিন্তু গরীবের মনুষ্যত্বে বিশ্বাস করে না। সতীর কাছে সে ভিখারী শিব নয়; শুধু ভিখারী, শুধু ভিখারী।

হার

সেদিন সকালে কাজ করতে এসে আমাদের ঠিকে ঝি নন্দর মা আঁচলের গিঁট খুলতে খুলতে বলল, 'দেখুন তো বউদিদি, জিনিসটা খাঁটি কি-না। না-কি আবাগী সোনা বলে গিল্টি চলাল আমার কাছে।'

চায়ের কাপ মাটিতে নামিয়ে রেখে লাবণ্য হেসে বলল, 'তোমাকে ঠকাবে, এমন লোক সারা শহরে কেউ আছে নাকি নন্দর মা। বাঃ, বেশ জিনিসটি তো।'

দাড়ি কামাতে কামাতে স্ত্রীর হাতের দিকে আড়চোখে আমিও একটু চেয়ে দেখলাম। সরু একছড়া পেণ্ডেণ্ট হার। লাবণ্য বার বার ক'রে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছে।

'একেবারে খাঁটি জিনিস। তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিনলে নাকি নন্দর মা। কত পড়ল ?'

আত্মপ্রসাদে নন্দর মা দাঁত বের করল, 'তা একরকম কেনাই বলতে পারেন বউদি। যত দেমাক আর বড়লোকীপনাই দেখাক, আর জাতের বড়াই করুক, চক্কোত্তি বউয়ের সাধ্যি নেই তিরিশ টাকা দিয়ে এ হার ফের ছাড়িয়ে নিয়ে যায়। তিন টাকায় একটা নতুন কলসী বাঁধা রেখেছিল। আজ চার মাস হয়ে গেল তাই ছাড়াতে পারল না।'

লাবণ্য বলল, 'তাহলে হারছড়া একরকম তোমারই হয়ে গেল, কি বল নন্দর মা। আঁচলে বেঁধে আর কাজ কি। এখন থেকে গলায় পরে বেরিয়ো, বেশ দেখাবে।'

নন্দর মা লজ্জায় জিভ কেটে বলল, 'কি যে বলেন বউদি, হার পরবার বয়স কি আর আমার আছে, না-কি সেই ভাগ্যি ক'রে এসেছি। 'যদি সুদিন পাই এ হার আমি আমার নন্দর বউকে পরাব। আশীর্বাদ করবেন বউদি—'

লাবণ্য বলল, 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। আশীর্বাদ করব বইকি। বেশ সুন্দর দেখে একটি বউ আনো ঘরে। তাকে মনের সাধে গয়নাগাঁটি পরাও। আমাদের নেমন্তন্ন ক'রে খাওয়াও-টাওয়াও। কি বল? খাওয়াবে তো?

লাবণ্য হাসল।

নন্দর মা বলল, 'সে ভাগ্যি কি আমার হবে বউদি?'

লাবণ্য বলল, 'হবে হবে। ভালো কথা, আজ কিন্তু এ-বেলাই কয়লা ভাঙতে হবে নন্দর মা। কয়লা একেবারেই নেই।'

'আমাকে তা বলতে হবে না বউদি। আমি সব দেখে নিয়েছি। সব করে দিয়ে তবে যাব।'

বলতে বলতে নন্দর মা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। পিছনে পিছনে গেল লাবণ্য; ওকে একটু সতর্ক ক'রে দিয়ে বলল, 'জিনিসটা ফের আঁচলে বাঁধলে? দামী জিনিস একটু পুরোন হলেও এখনও শ' খানেক টাকার কম হবে না। শহর বন্দর জায়গা। একটু সাবধান-টাবধানে রেখ, বুঝলে?

নন্দর মা-র গলা শুনতে পেলাম 'সাবধানেই রেখেছি বউদি। আমার আঁচলে এর চেয়েও অনেক দামী জিনিস কত সময়ে থাকে। কোনদিন একটা পয়সা হারায় না। অত বেহুঁশ মেয়েমানুষ নই বউদি।'

লাবণ্য বলল, 'তা ঠিক। তোমার হুঁশ খুব বেশি। আঁচলের গিঁট থেকে কিছু খোয়া যায় না। কেবল নন্দর হতভাগা বাপটাই গিঁট খুলে পালাল। আচ্ছা, সে বুঝি এখন একবার খোঁজখবর নিতেও আসে না।'

নন্দর মা কয়লা ভাঙতে শুরু ক'রে বলল, 'তার এসে কাজ নেই বউদি। তার নামও আমি আর মুখে আনিনে। আমার নন্দ, কমলা বেঁচে থাকুক। আমার দেহ যতদিন আছে আর আপনারা পাঁচজন আছেন, ততদিন আমার ভাবনা কি বউদি।'

লাবণ্য বলল, 'তাছাড়া নন্দর মত অমন ছেলেও হয় না। শুনেছি তোমার খুব বাধ্য।'

নন্দর মা সগর্বে বলল, 'বাধ্যের কথা কি বলছেন বউদি। এই একুশ বছর বয়স হোল, আমার মত না নিয়ে ঘরের একগাছা কুটো পর্যন্ত এদিক-ওদিক করে না। হাতে তুলে না দিলে কোন একটা জিনিস নিজে থেকে খাবে না—এমনি ছেলে। আমি এসব কাজ করি, নন্দর মোটেই আব তা ইচ্ছা নয়, বুঝলেন বউদি। রোজ বারণ করে। বলে এখন ওসব ছেড়ে দাও মা। আমি ফ্যাক্টরী থেকে যা পাই তাতেই আমাদের চলে যাবে। 'আমি বলি আর একটু শক্ত হয়ে নে বাপু তারপর আমাকে বসিয়ে খাওয়াস। বসে খাওয়ার দিন তো আমার সামনে পড়েই আছে। নাতি-নাতনী কোলে নিয়ে দিব্যি দিনরাত বসে বসে খাব। আব তোর বউ সংসাবের সব কাজ করবে। বউয়ের হয়ে তুই-ই তখন কত ঝগড়া কববি।'

নন্দর মার এই ভবিষ্যৎ পারিবাবিক চিত্র অত্যন্ত মধুর। কিন্তু মাধুর্য্যের আস্বাদনের জন্য লাবণ্যকে আমি বেশিক্ষণ ছেড়ে দিতে পারি না। সংসারে আরও অনেক কাজকর্ম আছে। আমি তাই স্ত্রীকে ডেকে ক্ষৌরী হবার সরঞ্জামগুলি ধুয়ে পবিষ্কার করে বাখার নির্দেশ দিয়ে বললাম, 'আব বাজাবের থলিটলি কি দেবে দাও। বসে বসে নন্দর গল্প শুনলেই তো আর দিন যাবে না। ভারি বক বক করতে পারে তোমার এই ঝি-টি।'

লাবণ্য হেসে বলল, 'তা করুক। কিন্তু এমন কাজের লোক আর মেলে না। এত ঝি দেখলাম কিন্তু নন্দর মার মত কেউ না। ওকে কোন কাজ বলে দিতে হয় না, সব নিজে দেখে শুনে করে, আর বেশ পরিষ্কার কাজ।'

বললাম, 'আর বেশ পরিষ্কার জিভ।'

লাবণ্য হাসল, 'না গো না। ঝি-দের জিভ তুমি আর কতটুকু

দেখলে। ওদের যা মুখ হয়, সে তুলনায় তো আমাদের নন্দর মা বোবা। সত্যি, অমনিতে বেশ মুখ বুজে কাজ করে যায় শুধু ছেলের কথা উঠলে ওর আর কথা ফুরোতে চায় না। রাতদিন কেবল ছেলে আর ছেলে। হবে না? ছেলে ছাড়া সংসারে ওর আছে কি। বদমাশ স্বামীটা অমন ক'রে ফাঁকি দিলে। ওই নন্দর দিকে তাকিয়েই তো ও বুক বেঁধেছে, এত খাটনি খাটছে বুড়ো বয়সে।

মাতা পুত্রের খবর স্ত্রীর কাছে এর আগেও শুনেছি। স্বামী প্রবঞ্চনা করবার পর নাবালক ছেলে আর একটি মেয়ে নিয়ে নন্দর মা ভেসে যায়নি। বরং শক্তভাবে নিজের সঙ্কল্পকে আঁকড়ে ধরেছে। বাড়ি বাড়ি ঝি গিরি করে কখনো বা চিড়া মুড়ি বিক্রি ক'রে নন্দ আর কমলাকে সে মানুষ করে তুলেছে। ছেলে মেয়েরাও বাপের পরিচয় কাউকে দেয় না, একমাত্র মাকেই চেনে। তাকেই শ্রদ্ধা ভক্তি করে। বাপের কথা উঠলে তারা নাক সিঁটকায়। কখনো সখনো হরলাল তাদের খোজ খবর নিতে এলেও তারা তার সামনে যায় না, কথা বলে না, বাবা বলে ডাকে না। সবই নন্দর মার শিক্ষা। হরলাল সুন্দরী মেয়েমানুষ চেয়েছিল—থাকুক সেই মেয়েমানুষ নিয়ে। সন্তানে তার দরকার কি। সন্তানের কিছু সে পাবে না। মায়ামমতা ভালোবাসা ভক্তিশ্রদ্ধা কিছু নয়। শুধু মরে গেলে নন্দর মা পিণ্ডি দেওয়ার অনুমতি দেবে নন্দকে। কিন্তু যতদিন বেঁচে আছে ততদিন একটা কাণাকড়িও যেন হরলাল প্রত্যাশা করে না। মেয়ের বয়স বার পেরুতে না পেরুতে শক্ত সমর্থ কর্মক্ষম জোয়ান ছেলে দেখে নন্দর মা তার বিয়ে দিয়েছে। ছেলেকেও স্কুলে দিয়েছিল। কিন্তু মা সরস্বতী তো আর সকলের দিকে মুখ তুলে চান না। তা না চাইলেন। সে জন্য নন্দর মার দুঃখ নেই। কোন দুষ্টা সরস্বতী তো তার ঘাড়ে চাপে নি। তাই ঢের। এত বয়স হয়েছে কিন্তু সামান্য বিড়িটা ছাড়া নন্দর কোনরকম নেশা ভাঙ নেই, কোনরকম বদ খেয়াল নেই।

মা ছাড়া অন্য কোন মেয়েছেলের মুখের দিকে পর্যন্ত তাকায় না। কে বলবে ও হরলাল দাসের ছেলে। কেউ তা বলুক নন্দর মা তাও চায় না। এ সবও তারই শিক্ষা। নন্দর মা ছেলেকে উঠতে বসতে শিখিয়েছে মেয়েমানুষের মত সংসারে অনাসৃষ্টি আর দু'টি নেই। ওরা পুরুষের কত যে ক্ষতি করতে পারে তা তো নিজের বাপকে দেখেই শিখতে পারে নন্দ। সমাজ গেল, সংসার গেল, অগ্নিসাক্ষী রেখে বিয়ে করা স্ত্রী এমন কি নিজের রক্তের ছেলে মেয়েরা পর্যন্ত ভেসে গেল, আর কায়েতের ছেলে হয়ে একটা নাপতিনীকে নিয়ে কিনা সারা জীবন মেতে রইল হরলাল। নন্দ যেন আগে থেকেই সাবধান হয়। কোন দিন যেন ছায়াও না মাড়ায় মেয়েমানুষের।

'তবে যে অত বিয়ের জন্য তাগিদ দিচ্ছ মা'

নন্দ একদিন হেসে জিজ্ঞাসা করেছিল।

নন্দর মা বলেছিল, 'ওমা পুরুষ ছেলে বিয়ে করবি না, বউ ঘরে আনবি না? বিয়ে করা বউ হোল ঘরের লক্ষ্মী, তারা পুরুষের ক্ষতি করে না, ধর্ম্মে কর্ম্মে সহায় হয়।

নন্দ একটুকাল চুপ ক'রে থেকে বলেছিল 'ও ঘরের সুধা বউদিও তো হরিপদদার বিয়ে করা বউ। ঘরের লক্ষ্মী। তবু তো হরিপদদা তাকে দু'চক্ষে দেখতে পারে না। বলে অপয়া, অলক্ষ্মী—ও এসে আমার সংসারের সব খুইয়েছে। তুমি ও তো তাই বল, বউটা লক্ষ্মীছাড়া।'

নন্দের গলায় একটু সহানুভূতির আমেজ লেগে থাকবে। নন্দর মার তা ভালো লাগেনি। সে বলেছিল 'বলিই তো, একশবার বলি। অলক্ষ্মী ছাড়া কি। ও ঘরে আসার পর থেকে ছেলেটার হাঁড়িতে আর কালি পড়ল না। এ চাকরি ছেড়ে সে চাকরি, সে চাকরি ছেড়ে ও চাকরি আজ ক'বছর ধরে এই তো করছে। কেবল নাই নাই খাই খাই রব। আর কেবল ঘরের জিনিস বাঁধা দিয়ে খাওয়া।

অলক্ষ্মী ছাড়া কি। কেবল গায়ের চামড়াটাই সাদা, ছাড়া আর কোন্ গুণ আছে ওর।'

নন্দ মৃদু প্রতিবাদ করেছিল 'যাই বল মা, ওপর থেকে কিন্তু তা মনে হয় না। এত অভাব অনটন, তবু কেমন হাসিখুশি, কত মিষ্টি কথাবার্তা। আমার এক বন্ধু সেদিন এসেছিল বেড়াতে। তুমি তো ছিলে না। সুধা বউদিই চা টা করে দিল। অমূল্য তো ভারি খুশি। খাওয়ার সময় বলল কি জানো, একেবারে লক্ষ্মী প্রতিমা'

নন্দর মা বিরক্ত হয়ে বলেছিল, 'থাক থাক, আর লক্ষ্মী লক্ষ্মী করতে হবে না। যার ঘরের লক্ষ্মী তার ঘরের লক্ষ্মী। এক ঘরের লক্ষ্মী আর এক ঘরে এসে অনর্থ ঘটায়। ওব সঙ্গে তোর অত মেশা মেশি করে দরকার কি।'

নন্দও মৃদু প্রতিবাদ করেছিল 'কি যে বল, কারো সঙ্গে মেশামেশি করবাব সময় কই আমাব।'

তা ঠিক। সময় নেই নন্দর। বেলা আটটা বাজতে না বাজতে খেয়ে দেয়ে ইটালীর এক এ্যাম্পুল ফ্যাক্টরীতে গিয়ে ঢোকে আর বেরিয়ে আসতে আসতে সন্ধ্যা হয়ে যায়। সবদিন সোজা বাসায় আসে না। ওর বন্ধু অমূল্যদের বাসায় গিয়ে গল্পটল্প করে। অমূল্যও কাজ করে ওই ফ্যাক্টরীতে। মেটেই মিশুক ছেলে নয় নন্দ। এ বয়সে যত ইয়ার বন্ধু ছেলেদের থাকার কথা তা ওর মোটেই নেই। নন্দর মাব ধারণা ওই বউটাই মন্দ। সেই ফাঁক পেলে যেচে যেচে আলাপ করতে আসে তার ছেলের সঙ্গে। চা-টুকু দিয়ে, পানটুকু দিয়ে সোহাগ দেখায়। নিজের স্বামী রোগাপটকা বাউণ্ডুলে হতচ্ছাড়া বলে তার সবল স্বাস্থ্যবান ছেলের দিকে মাগীর চোখ পড়েছে। কিন্তু ছেলের বিয়ে দিয়ে ওব চোখে লঙ্কাব গুঁড়ো ছিটিয়ে দেবে নন্দর মা। সুধা দিন রাত হিংসায় জ্বলে পুড়ে মরবে, সেই হবে ওর যোগ্য শাস্তি। নন্দর মা ছেলেকে আশ্বাস দিয়েছে, 'তোর বন্ধুর চোখ নেই। ওই

খুমসী মাগীকে লক্ষ্মী প্রতিমা বলে। আসল লক্ষ্মী আমি ঘরে এনে তোদের দেখাব। ছুটো দিন সবুর কর। সুন্দরী মেয়ের সন্ধানে লোক লাগিয়েছি আমি।' "

লাবণ্য এ কাহিনী বিবৃত ক'রে আমাকে সেদিন হেসে বলেছিল, 'সুধার ওপর নন্দর মার ভারি রাগ।

আমি জবাব দিয়েছিলাম, 'রাগ তো হতেই পারে।'

আর একদিন লাবণ্য বলল, 'জানো আজ কমলা এসেছিল বেড়াতে।'

বললাম 'কমল আবার কে।'

লাবণ্য বলল, 'অবাক করলে। কমলা নন্দর বোন। তিন তিনটি ছেলে মেয়ে হয়ে দিব্যি গিন্নীবান্নীর মত চেহারা হয়েছে। ঝির মেয়ে বলে মনেই হয় না। স্বামী ভালো কাজকর্ম করে কিনা, বেশ সুখেই আছে। ছু' দিনের জন্য এসেছে মার কাছে।'

বললাম, 'ভালোই তো।'

লাবণ্য বলল 'ওর কাছেও সুধার অনেক খবর শুনলাম।'

বেশি আগ্রহ না দেখিয়ে বললাম, 'তাই নাকি।'

লাবণ্য বলল, 'হ্যাঁ। দেখ আগে আমার ধারণা ছিল বউটা সত্যিই বুঝি নন্দকে গোপনে গোপনে ভালোবাসে। আসলে কিন্তু তা নয়।'

বললাম 'আসল ব্যাপারটা তা হলে কি।'

লাবণ্য বলল, 'ওর ঘরের অনেক জিনিস পত্রই তো নন্দর মার ঘরে বাঁধা কিনা, সেই সব জিনিসের মায়াতেই আসে। পরের ঘরে বাঁধা রাখা নিজের জিনিস যেন চোখে দেখে হাতে ছুঁয়েও সুখ। জিনিসের উপর ভারি মায়া বউটার।'

বললাম 'কেবল ও বউটার কেন সব বউয়েরই তাই। মায়া তোমারই বা কোন্ জিনিসে কম।'

লাবণ্য বলল 'আহাহা কথায় কথায় কেবল আমার তুলনা। কিন্তু যাই বল আমি সুধার মত অমন নির্লজ্জ হ'তে পারতাম না।'

বললাম 'কেন, নির্লজ্জতার কি হোল।'

লাবণ্য তখন সব ঘটনা খুলে বলল। সুধা নির্লজ্জ বইকি। নিজের জিনিস বাঁধা দিলে কি বিক্রি করলে তা যে আর নিজের থাকে না। তা কে না জানে। কিন্তু সুধা তা বুঝতে চায় না। সে দিন বুঝি বড় ঘটিটা মেজে এনে একটু শব্দ করেই সেটাকে মেঝের ওপর রেখেছিল কমলা। তাই শুনে পাশের ঘর থেকে প্রায় ছুটতে ছুটতে বেরিয়ে এসেছিল সুধা। তার সে কি মুখ, 'জিনিস বাঁধা রেখেছ বলে ভেঙে চুরে ছত্রছান ক'রে ফেলতে তো আর দিইনি কমলা। আমার জিনিসের ক্ষতি হলে ভালো হবে না কিন্তু।' কমলাও যে সে মেয়ে নয়, সেও মুখের উপর জবাব দিয়েছে, 'জিনিসতো আগে খালাস কর, তারপর ওসব কথা বলতে এসো। কই দু'মাস ধরে ঘটিটা পড়ে রয়েছে পারলে তো না ছাড়িয়ে নিতে, কি দু'টো পয়সা মাকে সুদ দিতে। ছাড়াবার দরকারও তো নেই, কাজ পড়লে অমনি আমাদের ঘরের জিনিস ধরে টান দাও। এমন বাঁধা বিক্রিতে মজা মন্দ নয়।'

সুধা আর কোন জবাব দেয়নি।

'কিন্তু শুধু ওকে দোষ দিলে কি হবে, আমার নিজের দাদাটির পর্যন্ত ওই সব ঘটি বাটির মধ্যে প্রাণ।'

কমলা মুখ টিপে হেসেছিল।

লাবণ্যও না হেসে পারে নি, 'তাই নাকি? কি রকম?'

কমলা জবাব দিয়েছিল, ওদের ঘরের বাঁধা রাখা কোন জিনিসের বিন্দুমাত্র হেনস্থা সহ্য করতে পারে না দাদা। ঘটিটায় কলসীটায় কোন সময় যদি একটু ঠোক্কর লাগল, দাদার বুকের মধ্যে যেন ঢেঁকির পাড় পড়ে। মুখ কালো হয়ে যায়। বলে পরের জিনিস একটু

সাবধানে নাড়তে চাড়তে পারিস নে ? তা ছাড়া ওসব জিনিস আমাদের ব্যবহার করবার দরকারই বা কি। তুলে রাখলেই হয়। কমলাও ছাড়বার পাত্রী নয়, বলে তুলেই রাখতাম দাদা। কিন্তু এ ঘটির জল খেলে প্রাণ যত ঠাণ্ডা হয়, আর কোন ঘটির জলে তেমন হয় না। শুনে কমলার দাদা গম্ভীর হয়ে থাকে। বললাম, 'আর হরিপদ ? এ সব শুনে সেও কি শুধু গম্ভীর হয়েই থাকে নাকি ? কিছু বলে না ?'

লাবণ্য বলল, 'বলবেনা কেন ? সে সব চেয়ে সেয়ানা। সে চোরকে বলে চুরি করতে গৃহস্থকে বলে জেগে থাকতে। নন্দর সঙ্গে কথা বলার জন্য বউকে শাসায়, আবার দরকার পড়লে আড়ালে আবডালে ওই নন্দর কছেই হাত পাতে। দিব্যি হেসে বলে তোমাদের সম্পর্ক তো দেওব বউদির মত। একটু রঙ্গ রসিকতা করলেই কি মহাভারত অশুদ্ধ হয় নাকি। তবে মেয়ে মানুষকে আস্কারা দিতে নেই। ওদের সিধে রাখতে হলে নরম গরম সবরকমই চল রাখতে হয়, বুঝলে ভায়া ? দাও দেখি গোটা তিনেক টাকা। সামনের সোমবার ঠিক দিয়ে দেব। কথার নড়চড় হবে না।'

বললাম 'এ সব তুমি পেলে কোথায় ? নন্দ কি এ সব কথাও কমলাকে বলেছে নাকি ?'

লাবণ্য বলল, 'রাম বলো। নন্দ তেমন মানুষই নয়। কমলাই আড়াল থেকে সব শুনেছে স্বচক্ষে দেখেছে।'

বললাম, 'যাই বল নন্দর এবার বিয়ে দেওয়া উচিত।'

লাবণ্য বলল, 'নন্দর মাও তো মেয়ে খুঁজছে। কিন্তু পছন্দ মত মেয়ে নাকি মিলছে না। নন্দর মা আর বোনের যদি বা পছন্দ হয়, নন্দর নাকি মোটেই পছন্দ হয় না।'

লাবণ্য একটু হাসলো।

বললাম, 'ভারি ভাবনার কথা তো।'

মাস তিনেক বাদে কি একটা বই পড়ছিলাম, বাইরের গোলমালে শান্তিভঙ্গ হোল। কান পেতে শুনলাম লাবণ্যের সঙ্গে নন্দর মা কি নিয়ে কথা কাটাকাটি করছে। স্ত্রীকে ডেকে বললাম 'দেখ, ঝিয়ের সঙ্গে ঝগড়া ক'রে অনর্থক নিজের গলা খারাপ কর কেন, পোষায় রাখ, না পোষায় ছাড়িয়ে দাও।'

লাবণ্য বলল, 'তাই ছাড়াতে হবে, আজকাল বড় খিটখিটে হয়েছে আর কেবল মুখে মুখে তর্ক করে। আগে এমন ছিল না।'

বললাম, 'ওদের মুখ আর মেজাজ খারাপ হবে তা আর বিচিত্র কি। তিন বাড়ি না চার বাড়ি কাজ করে—'

লাবণ্য বাধা দিয়ে বলল, 'তা তো আগেও করত। কিন্তু আজকাল ওর স্বভাবই যেন কেমন হয়ে গেছে।'

সন্ধ্যার পর অফিস থেকে ফিরে এসে একথা সে কথার পর লাবণ্য হঠাৎ বলল, 'দেখ একটা কাজ করে বসেছি। নন্দর মা এমন ক'রে ধরে পড়ল যে, কিছুতেই আর না করতে পারলাম না।'

বললাম, 'ভূমিকা রেখে ব্যাপারটা বল।'

ব্যাপার আর কিছুই নয়, নন্দর মা তার সেই বন্ধকী হারছড়া লাবণ্যের কাছে গচ্ছিত রেখে গেছে। ও হার নিজের বাড়িতে রাখতে তার নাকি আর সাহস নেই। লাবণ্য কিছুতেই রাখতে চায়নি, কিন্তু অনেক অনুনয় বিনয় কাকুতি মিনতি ক'রে নন্দের মা লাবণ্যকে হারগাছা গছিয়ে গেছে। এই হার নিয়ে ছেলের সঙ্গে কদিন ধরেই কথান্তর চলেছে, সেইজন্যই নন্দর মার মন মেজাজ ভালো ছিল না, সকাল বেলা লাবণ্যের সঙ্গে অমন তর্ক করেছিল। লাবণ্য যেন মনে না রাখে নিজগুণে যেন সব ক্ষমা করে।

বললাম, 'তোমার অগাধ গুণের কথা না হয় স্বীকার করলাম। কিন্তু ব্যাপারখানা কি, হার নিয়ে নন্দই বা অমন হঠাৎ মেতে উঠল কেন।'

লাবণ্য বলল, 'সে নিজে কি আর মেতে উঠেছে, তাকে মাতিয়ে তুলেছে যে।'

সমস্ত ঘটনাই খুঁটে খুঁটে নন্দর মার কাছ থেকে লাবণ্য শুনেছে, কিন্তু আমাকে না শোনান পর্যন্ত তার পুরোপুরি তৃপ্তি নেই।

সব দোষ ওই সুধার। দিন কয়েক আগে নন্দর মা বুঝি কমলার সঙ্গে বলাবলি করছিল, নন্দ যাই বলুক গোবরার ওই ফটিক দাসের মেয়েটির সঙ্গে তার বিয়ে দেবে। মেয়েটি বেশ লক্ষ্মীমন্ত। পাকা কথা দিয়ে দিনক্ষণ শীগগিরই ঠিক করে আসবে নন্দর মা। কিন্তু আসবে তো এদিকে খরচ যে কি কবে কুলোবে তা তো নন্দর মা ঠিক করতে পারছে না। হাতে যা ছিল, সবই তো পরকে ধার দিয়ে রেখেছে। আর মানুষেরও এমন আক্কেল, নেওয়ার বেলায় কাক পক্ষীর মত উড়ে আসে, কিন্তু দেওয়ার বেলায় ছ'মাসেব মধ্যেও একটি পয়সা হাত উপুড় করবার লক্ষণ নেই। অথচ নতুন বউয়েব মুখ তো কিছু দিয়ে দেখতেই হবে। যে হারছড়া আছে ওই-গাছাই কর্মকাবের দেকানে দিয়ে নতুন করে পালিস করিয়ে নেবে নন্দর মা। ওই দিয়েই মুখ দেখবে বউয়েব।

কমলা বলেছিল, 'সেকি মা ও হারতো ও ঘরের সুধা বউদির। শেযে যদি সে এসে গোলমাল করে।'

নন্দর মা বলেছিল 'ঈষ, গোলমাল করলেই হোল। জিনিস বন্ধক দিয়ে ফিরিয়ে না নিলে কতকাল আর তা নিজের থাকে লো। দু'-মাসের কড়ারে টাকা ধার নিয়ে আজ চার চার মাস হয়ে গেল মাগী একটা পয়সা আমার হাতে ছোঁয়ালে না। আমার টাকার দাম নেই? মুখে রক্ত তুলে টাকা রোজগার করতে হয় না আমাকে? নাকি লোকে টাকা আমাকে মুখ দেখে দেয়? তুই দেখে নিস কমলি, এই হার যদি দু'চার দিনের মধ্যে ও ছাড়িয়ে না নেয়,

দরকারের সময় আমি আমার টাকা ফেরত না পাই তা হলে এ হারও সে কোনদিন পাবে না।'

কমলা এদিক ওদিক তাকিয়ে বলেছিল, আস্তে, আস্তে। সুধা বউদি বোধ হয় বেড়ার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে।'

নন্দর মা বলেছিল, 'আড়ালে কেন, বুকের পাটা থাকে সামনে এসে দাঁড়াক না। আমি যা বলবার মুখের ওপরই বলব। ভয় করি নাকি কাউকে। হার যদি ও দু'দিনের মধ্যে না ছাড়িয়ে নেয় এই দিয়ে আমি ছেলের বউয়ের মুখ দেখব। আমার ছেলের বউ এই হার পরে ওর চোখের সুমুখ দিয়ে ঘুরে বেড়াবে তাই দেখব আমি।'

আশ্চর্য, তৃতীয় দিনেই সুধা দশটাকার তিনখানা নোট আর একটা রূপার টাকা নিয়ে এসে হাজির, 'আমার হারছড়া এবার ফিরিয়ে দাও মাসী।'

নন্দর মা খানিকক্ষণ অবাক হয়ে থেকে বলল, 'রাত পোহাতে না পোহাতে তুমি এত টাকা পেলে কোথায় বউ। দশটাকা ঘরভাড়া দিতে পারনি বলে কাল রাত্রেও বাড়িওয়ালা তোমাদের কতকথা শুনিয়ে দিয়ে গেল। তাই নিয়ে স্বামীস্ত্রীর মধ্যে তোমাদের সারারাত ঝগড়া। দু'দণ্ড সুস্থ হয়ে ঘুমোতে পারিনি। আর আজ ভোর হ'তে না হ'তে এত টাকা তুমি কোথায় পেলে।'

সুধা জবাব দিয়েছিল 'অত কথায় তোমার কাজ কি মাসী। জিনিস বন্ধক রেখে টাকা ধার দিয়েছ। তোমার টাকা তোমাকে ফিরিয়ে দিচ্ছি, আমার জিনিস আমাকে দাও, ল্যাঠা চুকে যাক।'

নন্দর মা রুক্ষস্বরে বলেছিল, 'ল্যাঠা অত সহজে চোকে না বউ। এর মধ্যে তোমার অনেক কারসাজি আছে। এবার সব বুঝতে পারছি আমি। অন্যবার নন্দর কাছে টাকা চাইতে হয় না, মাইনে পেলেই আমার হাতে দেয়। এবার একদিন গেল, দু'দিন গেল, টাকা আর দেয় না। শেষে নিজেই বললাম, নন্দ মাইনে পাস নি, আজ

সাত তারিখ হয়ে গেল মাসের। ছেলে বলল, পেয়েছি মা। হেসে বললাম একেবারে বউয়ের হাতে দিবি বলেই বুঝি জমিয়ে রেখেছিস। মার হাতে দিতে আর ইচ্ছা করে না। এত কথা বলবার পর নন্দ টাকা এনে হাতে দিল। দেখি তিরিশ টাকা কম। জিজ্ঞেস করলাম টাকা এত কম কেনরে। ছেলে বলল, এক বন্ধুর বিপদে ধার দিতে হয়েছে মা, ক'দিন বাদেই শোধ দেবে। তিরিশ তিরিশটে টাকাই ধার। ভাবলাম হবেও বা। এখন সে বুঝতে পারছি বিপদটা কিসের আর তার সেই পরম বন্ধুটিই বা কে।'

ঠোঁট বাঁকিয়ে চোখ তেরছা করে নন্দর মা সুধার দিকে অদ্ভুত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়েছিল। সে দৃষ্টি সুধা সহ্য করতে পারে নি। চোখ ফিরিয়ে নিয়েছিল পর মুহূর্তে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নন্দর মার দয়া হয় নি, লজ্জিত অপমানিত থেকে সুধাব দিকে তাকিয়ে সে ফের চেঁচিয়ে উঠেছিল—'পাবি নে, ও হাব তুই কিছুতেই পাবিনে। আমার ছেলের কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে আমার দেনা শোধ করতে এসেছিস, লজ্জা করে না? দে, টাকা দে, আমার ছেলের টাকা ফিরিয়ে দে শীগগির।'

টাকা জোর করে কেড়ে নিতে গিয়েছিল নন্দর মা; কিন্তু সুধা তাকে টাকা দেয় নি, বলেছিল, 'আমার হার ফিরিয়ে না দিলে এ টাকা আমি দেব না।'

বলে তাড়াতাড়ি নিজের ঘবে চলে গিয়েছিল সুধা। কিন্তু সেখানে যে হরিপদ ওত পেতে বসে আছে, তা তার নজরে পড়ে নি।

ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে হরিপদ তাকে সাদরে জাপ্‌টে ধরেছিল—'বলি ও সতীলক্ষ্মী, এত টাকা রোজগাব করেছ, আর নাকি তোমার হাতে টাকা নেই। দাও দাও, কিছু ভাগ দাও, কিছু ভাগ দাও। আরে এখন না হয় ফেলনা গেছি, কিন্তু মন্তর পড়ে বিয়ে তো আমিই করেছিলাম। স্বামী সেজে এখনও চারদিক আগলে কুল মান

লাজ-লজ্জা সব রক্ষা করছি, আমার ন্যায্য পাওনাটা দেবে না আমাকে ?

সুধার হাত থেকে কুড়ি টাকা ছিনিয়ে নিয়ে হরিপদ সেই যে চলে গিয়েছিল, সারা দিনরাত আর বাড়ি-মুখো হয় নি।

কিন্তু নন্দ বাসায় ফিরেছিল সন্ধ্যার পরই, আর সঙ্গে সঙ্গে তার মা তাকে পাকড়াও করেছিল, 'হ্যাঁরে নন্দা, এই নাকি সব কাণ্ড হচ্ছে আজকাল ?'

ধরা পড়বার পর নন্দ সবই স্বীকার করেছে। সুধা বউদিকে সে ধার দিয়েছে তিরিশ টাকা। মা যেন তার হার তাকে ফেরত দেয়। পরের জিনিস ঘরে রাখবার তারই বা এত লোভ কেন ?

নন্দর মা বলেছে, টাকা সে ফেরত পায় নি। সুতরাং ও হার ন্যায়ত এখনও তারই। ছেলের বউ এলে এ হার নন্দর মা তাকে প্রথমে পরাবে। তারপর সে হার নিয়ে নন্দ যা খুশি তাই করুক, সোহাগ করে পরের বউয়ের গলায় দিক কিংবা বাজারের বেশ্যাকে পরিয়ে আসুক, নন্দর মা তা দেখতেও যাবে না।

নন্দ তবু জিজ্ঞেস করেছে, 'কই সে হার ?'

নন্দর মা জবাব দিয়েছে, সে হার তার কাছে নেই, অন্য লোকের কাছে রেখেছে।

বুদ্ধিটা সেই কালই মাথায় খেলেছে নন্দর মার। লাবণ্যের কাছে আজ হার রাখতে এসে নন্দর মা তাকে পই পই ক'রে নিষেধ ক'রে গেছে তাকে ছাড়া এ হার যেন লাবণ্য আর কাউকে না দেয়। নন্দর মার নিজের বাপ এলেও নয়।

'তোমার বাবা এখনও আছে না কি ?'

লাবণ্য জিজ্ঞেস করেছিল।

নন্দর মা বলেছিল, 'না নেই, কিন্তু আমার সেই মরা বাপ যদি শ্মশান থেকে উঠে এসে হার চায়, তবু তাকে দেবেন না বউদি, আমার দিব্যি রইল।'

নন্দর মার মরা বাপ অবশ্য হার চাইতে এল না, এল তার তাজা জোয়ান ছেলে। রবিবার। দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর বিশ্রাম করছি, সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল। বিরক্ত হয়ে হুড়কো খুললাম। এই অসময়ে কে এল আবার, দেখি লম্বা-চওড়া একুশ-বাইশ বছরের এক যুবক। রঙ শ্যামবর্ণ, কিন্তু বেশ সুপুরুষ। মাথার চুল কোঁকড়ানো, টানা টানা নাক চোখ, পাতলা ঠোঁট, দাড়ি-গোঁফ নিখুঁতভাবে কামানো। পরনে ফর্সা ধুতি, পাঞ্জাবী, পায়ে নতুন সাদা স্ট্রাইপের স্যাণ্ডাল।

বললাম, 'আপনাকে ঠিক চিনতে পারছি না তো?'

ছেলেটি একটু হাসল—'আমার নাম নন্দলাল দাস। আমার মা আপনাদের বাড়িতে—'

বললাম, 'ও, তা তোমার মা তো এখন নেই। সে তো এখানে সকালে আর সন্ধ্যায় কাজ করতে আসে।'

নন্দ বলল, 'তা জানি। আমি তার খোঁজে আসিনি। আপনাদের সঙ্গে অন্য কথা আছে।'

বললাম, 'কথা আছে? বেশ তো ভিতরে এসো।'

ঘরে এসে বসবার জন্য ওর দিকে টুলটা এগিয়ে দিলাম। একটু বাদে কৌতূহলী লাবণ্যও এক পাশে এসে দাঁড়াল। ওর চোখ হাতের বোনা জাম্পারের দিকে, কান আমাদের কথাবার্তায়।

নন্দ বেশি ভূমিকা করল না, একটু ইতস্তত করে বলল, 'দেখুন আমি কমলার কাছ থেকে সব কথা বের করে নিয়েছি। মা রাগ করে হারছড়া আপনাদের কাছেই রেখে গেছে, জিনিসটা আমাকে দিয়ে দিন।'

বললাম, 'তার উপায় নেই নন্দ, এ জিনিস আমরা যার কাছ থেকে পেয়েছি, তার হাতেই দেব। তোমার মার মত ছাড়া এ হার তোমাকে দিতে পারি নে।'

নন্দ একটু রুষ্ট ভঙ্গীতে বলল, 'পারেন না? কিন্তু এ হার তো

মার নয়। এ যার হার, সে টাকা নিয়ে সাধাসাধি করছে। তবু দেবেন না? বেশ আমি দিচ্ছি টাকা।'

এবার আমারও ধৈর্যচ্যুতি ঘটল, বললাম, 'তুমি ভুল করছ নন্দ। আমরা টাকা দিয়ে তোমার মার কাছ থেকে হার বন্ধক রাখি নি। তোমার মা অমনিই বিশ্বাস করে তার জিনিস আমাদের কাছে রেখে গেছে। বেশ, তাকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো। সে যদি বলে, তার হার এক্ষুনি দিয়ে দেব।'

'আচ্ছা।' বলে নন্দ উঠে পড়ল। তার ভাবে-ভঙ্গীতে মনের রাগ গোপন রইল না।

সন্ধ্যার একটু আগে আগে কাজে এল নন্দর মা। লাবণ্য বলল, 'একেবারে বেলা শেষ করে এলে, তা এসেছ বেশ করেছ। কিন্তু তোমার হার তুমি নিয়ে যাও বাছা। তুমি আমার কাছে জিনিস রেখে যাবে, আর তোমার ছেলে এসে সেই জিনিস দাবী করবে, এত ঝামেলা ঝক্কি পোহাবার সময় আমাদের নেই নন্দর মা। তার চেয়ে তোমার হার তুমি নিজের কাছে নিয়ে রাখ সেই ভালো।'

নন্দর মা বলল, 'ও এসেছিল বুঝি হার নিতে? আসবে তা আমি জানতাম। লাজলজ্জা বলতে ওর কিছু নেই। সব সেই মাগীর পায়ে সঁপে দিয়েছে। কিন্তু আপনার ভাবনা নেই বউদি। আর ও আসবে না, আজ আর ঢাক-ঢাক গুড়-গুড় নেই। এক বাড়ি লোকের সামনে ওকে শাসন করেছি। যদি বাপের জন্ম হয়, তবে আর হারের জন্য এ-মুখো হবে না।'

শাসনের কথাটাও নন্দর মা সবিস্তারে বলল লাবণ্যকে। এক বস্তী লোকের মধ্যে গলা ছেড়ে নন্দর মা ধমকেছে ছেলেকে। হরিপদর ওই বাঁজা বউটাই যে তার ছেলের মাথা খেয়েছে, তা সবাইকে ডেকে শুনিয়েছে নন্দর মা। যত সব ফিস ফিস গুজ গুজ ওই বউটার সঙ্গে। তার জন্য নন্দ টাকা খরচ করে। সাবান, স্নো থেকে শুরু করে শাড়ি,

গয়না পর্যন্ত জোগায়। এদিকে মা পরের বাড়িতে ঝি-গিরি করে মরে, তার জন্য একটু হা-হুতাশ নেই ছেলের। নন্দর মা ভালো করতে চাইলে হবে কি! যে মানুষের রক্তে জন্মেছে, তেমন তো হবে। সব সেই রক্তের দোষ। এর পর অসহায়ভাবে সকলের কাছে আবেদন জানিয়েছে নন্দর মা। সে আর পারে না। তার আর সাধ্য নেই। সে বলে বলে হয়রান হয়ে গেল। এবাব দশজনে ভার নিক। দশজনে মিলে শুধরে দিক তাব ছেলেকে, তার দেহের বদ-রক্ত সব বের করে ফেলুক। শুনে বস্তীর কেউ কেউ হেসেছে, কেউ বা নন্দব মাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছে, সত্যিই তো ভদ্দরলোকের বাড়িব মধ্যে এসব কি কেলেঙ্কারী কাণ্ড! ফেব যদি নন্দর কোন বেচাল দেখে তারা, তার হাড়-মাস আলাদা করে ছাড়বে।

পরদিন সকালে কাজে এল নন্দব মা। মেজাজ তেমনি বিগড়ানো। বকুনি খেয়ে সেই যে ছেলে সন্ধ্যায় বেরিয়েছে, আর সারারাতের মধ্যে ফেরে নি। ভোরেও আসে নি ঘরে।

নন্দর মা নিজেই বলল, 'না এসে যাবে কোন্ চুলোয়, ফ্যাক্টরীতে বেরুতে হবে না? গিলতে হবে না পিণ্ডি?'

ছেলের 'পিণ্ডির' ব্যবস্থা করবার জন্যই যেন নন্দর মা তাড়াতাড়ি কাজ সেরে আগে আগে বিদায় নিল। বাটনাটুকু পর্যন্ত ক'রে দিয়ে গেল না—বলল, 'যা আছে তাই দিয়েই এবেলা চালিয়ে নিন বউদি, ওবেলা এসে সব করব। যাই, সময়মত ভাত না পেলে বাবু আবার কুরুক্ষেত্র বাধাবে, ওবেলা সকাল সকালই আসব।'

কিন্তু আমি অফিস থেকে ফিরলাম, সন্ধ্যা উতরে গেল। তবু নন্দর মা কাজে এল না। লাবণ্য নিজেই সব সারতে সারতে বিরক্ত হয়ে বলল, 'না, ওকে দিয়ে আর কাজ চলল না দেখছি। মায়ে-ছেলে ঝগড়া করবে, আর আমার কাজে করবে কামাই। এবার আসুক আচ্ছা করে বলে দেব।'

পাশের ডাক্তার বাড়িতেও নন্দর মা কাজ করে। উন্থনে তরকারি চাপিয়ে লাবণ্য এক সময় জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ডাক্তারবাবুর স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, 'নন্দর মা এবেলা আপনাদের বাড়িতে কাজে এসেছিল দিদি? বলা নেই, কওয়া নেই, দেখুন তো, হঠাৎ এমন কামাই করলে কি চলে? আমি সন্ধ্যা পর্যন্ত ওর জন্য বসেছিলাম।'

ডাক্তারবাবুর স্ত্রীও তাঁর জানলায় এসে দাঁড়ালেন, 'ও মা, তুমি কিচ্ছু শোন নি? তুমি ছিলে কোথায় এতক্ষণ?'

লাবণ্য বিস্মিত হয়ে বলল, 'কেন কি হয়েছে?'

ডাক্তারবাবুর স্ত্রী বললেন, 'আর যা হবার তা হয়ে গেছে। নন্দ বিষ খেয়েছে। উনি খবর পেয়ে দেখতে গিয়েছিলেন। নন্দর মা ওঁর পা ধরে কত কান্নাকাটি না করেছে। বলে, আমার ছেলেকে বাঁচিয়ে দিন। আমার যা আছে সব দেব। এসব কথা শুনে ঠিক থাকা যায় না লাবণ্য। ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি। শুনলে গায়ে কাঁটা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল; কিন্তু হলে হবে কি। এ তো যে সে জিনিস নয়—একেবারে পটাশিয়াম সায়ানাইড। সাক্ষাৎ যম। বিষ অবশ্য হাসপাতালে বের করে ফেলা হয়েছিল; কিন্তু সেই সঙ্গে প্রাণবায়ুও বেরিয়ে এসেছে। এই সন্ধ্যার একটু আগে সব শেষ হয়ে গেছে।'

ছুজনে স্তব্ধ হয়ে রইলাম। লাবণ্যের কড়া থেকে তরকারির পোড়া গন্ধ এ ঘরে ভেসে এল।

দিন ছুয়ের মধ্যে আর কারও সারা পাওয়া গেল না। না নন্দর মা—না কমলা— কেউ আর এ-মুখো হোল না।

লাবণ্য বলল, 'ঠিকানা আমার কাছে আছে। তুমি একবার যাও।'

বললাম, 'গিয়ে আর কি করব।'

লাবণ্য বলল, 'ওদের জিনিসটাও তো আছে আমার কাছে। কাজ -না করুক, সেটা তো নেবে।'

বললাম, 'রেখে দাও, যখন দরকার হয় এসে নেবে।'

দরকার তার পরদিনই হোল। সকালবেলায় এসে হাজির হোল নন্দর মা। ওর দিকে আর তাকানো যায় না। এই ক'দিনে বয়স যেন আরো দশ-পনের বছর বেড়ে গেছে। আগে ও চুল এত পাকা ছিল না। দুটো গাল তোবড়ানো, ঘোলাটে চোখ দুটো গর্তে ঢুকেছে। ময়লা শাড়িখানা নানা জায়গায় ছেঁড়া। গা'রও এখানে-ওখানে ছড়ে গেছে।

লাবণ্য ওর চেহারা দেখে বলল, 'আজকে আর তোমার কাজ করতে হবে না নন্দর মা।'

নন্দর মা বলল, 'কাজ আমি একটু পরে এসে করব বৌদি। সেই হার-ছড়া এখন দাও। তাই নিতেই এসেছি। সেই রাক্ষুসী সর্বনাশীর চোখের সামনে এ হার আমি টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ব, তবে ছাড়ব। জন্মের মত হার পরাব সর্বনাশীকে। ওর জন্যই তো, ওর জন্যই তো আজ আমার এই দশা—নইলে সোনার সংসার আমার—'

হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল নন্দর মা।

লাবণ্য আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞেস করল, 'দেব নাকি হার ? ওর তো এখন মাথার ঠিক নেই।'

বললাম, 'চাইছে' যখন দিয়ে দাও। ও হার তুমি রেখেই বা কি করবে ?'

লাবণ্য আর কোন কথা না বলে ট্রাঙ্ক খুলে হারছড়া বের করে দিল।

বিকালবেলা কোলের ছেলেকে কাঁখে নিয়ে কমলা এসে কাজে হাত দিল, বলল, 'মা বড় কান্নাকাটি করছে, আপনার শরীর ভাল না, আমিই এলাম কাজ করতে।'

লাবণ্য লজ্জিত হয়ে বলল, 'না না, তোমাকে কিচ্ছু করতে হবে না। এত বড় সর্বনাশ হয়ে গেল তোমাদের। তুমি যাও. তোমার

মাকে সান্ত্বনা-টান্ত্বনা দাও গিয়ে। কাজ যা আছে, আমিই করে নেব।'

একটু চুপ করে থেকে লাবণ্য ফের বলল, 'হ্যাঁ, কমলা, একটা কথা জিজ্ঞেস করি। হারছড়া কি সত্যিই নষ্ট করে ফেলেছে নাকি তোমার মা?'

চা খেতে খেতে উৎসুক হয়ে জবাবের জন্য আমিও কমলার মুখের দিকে তাকালাম। উনিশ-কুড়ি বছরের একটি শান্ত, সরল মেয়ে। বেশ ভরাট গোলগাল মুখ। সিঁথিতে মোটা সিঁদুরের দাগ। কপালে ফোঁটা। রঙ কালো। কিন্তু মুখে যেন আরও একপোঁচ বেশি। মনে হল সমস্ত মুখখানায় কে যেন খুব ঘন করে কালি লেপে দিয়েছে।

মুখ নীচু করে কমলা বলল, 'না নষ্ট করে নি। নষ্ট করতেই গিয়েছিল, কিন্তু পাবেনি।'

লাবণ্য বলল, 'তোমরা পাঁচজনে বাধা দিলে বুঝি?'

কমলা বলল, 'না, আমরা কাছে যাই সাধ্য কি। হার নিয়ে নিজেই সুধা বউদির ঘরে ঢুকেছিল মা। তারপর সব দেখে শুনে একেবারে থ' হয়ে গেল।'

লাবণ্য বলল, 'কি এমন দেখল সুধার ঘবে গিয়ে।'

কমলা বলল, 'দেখল দেয়ালে মাথা গুঁজে সুধা বউদি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদছে, কোন সাড়া নেই, শব্দ নেই, শুধু চোখের জল ঢালু মেঝের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নর্দমার দিকে যাচ্ছে।'

জিজ্ঞেস করায় কমলা সবই খুলে বলল। এই দু'দিন ধরে নন্দর মা যখন দিনরাত উঠানে গড়াগড়ি করে চীৎকার করেছে, কমলাও কেঁদেছে গলা ছেড়ে, তখন সুধাকে দেখা গেছে সবান্ধব স্বামীর জন্য সে রান্না করছে, তাদের ঠাঁই করে খেতে দিচ্ছে. ঘর-সংসারের অন্য কাজকর্ম করছে। সুধা তাদের প্রবোধ দিতে আসেনি, সান্ত্বনা দিতে

আসেনি। একটা হা-হুতাশের শব্দও মুখ থেকে বেরোয় নি তার। কমলা গলা ছেড়ে বলেছে, ওতো মানুষ নয়, পাষাণ, পাষাণ। রাক্ষুসী। আমার দাদাকে আস্ত গিলে খেয়েছে।

অমন মুখরা স্বভাবের বউ কিন্তু এসব কথার কোন প্রতিবাদ করেনি।

তারপর আজ যখন হার নিয়ে ওর ঘরে ঢুকল নন্দর মা, কেউ যে ঘরে এসেছে, তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে, সুধা অনেকক্ষণ পর্যন্ত টেরই পেল না। কিন্তু ওর কান্না দেখে কোন মায়া হয়নি নন্দর মার। তার নিজের চোখে তখন আর জল নেই, শুধু আগুন। বুকে আগুন, মুখে আগুন, চোখে আগুন, আগুনে পুড়ে যাচ্ছে সর্বাঙ্গ।

খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে নন্দর মা বিষঢালা কণ্ঠে বলল, 'নাও বউ, হার নাও। হার নাও। হারের জন্য পাগল হয়ে গিয়েছিলে, হারের জন্য আমার ছেলেব হাত জড়িয়ে ধবেছিলে, এই নাও সেই হার। সোহাগ করে গলায় পর, আমি দেখে চোখ জুড়াই।'

মানুষের সাড়া পেয়ে প্রথমে সুধা চমকে উঠেছিল। ফের দেয়ালের কোণে মুখ লুকিয়েছিল লজ্জায়। তার এই গোপন শোকের কেউ সাক্ষী থাক, এ যেন তার ইচ্ছা নয়। কিন্তু নন্দর মা তাকে লুকিয়ে থাকতে দিল না, ফের ডেকে বলল, 'কই গলা এগিয়ে দাও, এস এদিকে।'

সুধা আর সামলাতে পারল না, ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। 'দিচ্ছি মাসীমা, দিচ্ছি। গলা এগিয়েই দিচ্ছি। কিন্তু ওই সরু সোনার হারে তো এ-অভাগীর গলার ফাঁস তৈরি হবে না। আরও মোটা করে দড়ি পাকিয়ে নিয়ে এস। সেই হার পরাও আমাকে, সেই হার পরাও।'

হঠাৎ নন্দর মার পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল সুধা, 'মাসীমা, কি হোল, কি সর্বনাশ হোল। কেন সে এমন সর্বনাশ করে গেল।'

আর কোন লজ্জা নেই, সঙ্কোচ নেই, দ্বিধা নেই, ভয় নেই ; শুধু মাথার আঁচলই খুলে পড়েনি সুধার, সমাজ-সংসারের সমস্ত বাঁধন আলগা হয়ে খসে পড়েছে।

সুধা বলতে লাগল, 'হ্যাঁ, আমি তার কাছে হার চেয়েছিলাম, বলেছিলাম, আমার হার উদ্ধার করে দাও। কিন্তু সেকি এইরকম করে? কিন্তু সেকি আমি দেখতে চেয়েছিলাম, সে আমার জন্য কি করতে পারে, কি দিতে পারে। কিন্তু এছাড়া দেওয়ার জিনিস সেকি আর কিছু চোখে দেখল না? আমার সব অহংকার গুঁড়ো করে দিয়ে গেল, দশজনের কাছে আমাকে হারিয়ে দিয়ে গেল, কিন্তু সে নিজেই কি জিততে পারল, তারই কি মুখ রইল এতে?'

নন্দর মা আরও খানিকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে হারছড়া আস্তে আস্তে সুধার গলায় পরিয়ে দিল।

সুধা আর্তনাদ করে উঠল, 'মাসীমা'।

নন্দর মা বলল, 'আমি দিচ্ছি বউমা, পর। তার বড় সাধ ছিল যার হার তাকে ফিরিয়ে দেবে। সে তা দিয়ে যেতে পারল না, দেখে যেতে পারল না। আমাকে দেখতে দাও বউমা। আমার চোখ জুড়াক ; বিষের জ্বালায় যে জ্বলে পুড়ে গেছে তার বুক জুড়াক।'

কমলা আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছিল। ভাবছিল এবার ঘরে ঢুকবে। কিন্তু কথা শেষ করতে না করতে নন্দর মা দুহাতে সুধার গলা জড়িয়ে ধরল। সুধাও ছোট্ট মেয়েব মত নন্দর মাকে আঁকড়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

এর পর কমলা আর ঘরে ঢুকতে পারেনি, সেখানে দাঁড়িয়েও থাকতে পারেনি। বাড়ি থেকে সোজা চলে এসেছে কাজে। লাবণ্য তাকে আজ কাজ করতে দিক।

চাই সুহাসিনী তরল আলতা, চাই সুহাসিনী তরল আলতা—'

ছুটির দিনে বিকেলে পুরনো বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলাম, হকার এসে জানলার ধারে দাঁড়াল, 'আলতা নেবেন বাবু ?'

আমি একটু বিরক্ত ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে বললাম, 'না।'

হকার নাছোড়বান্দা। জানলার শিক শক্ত করে ধরে হকার নরম অনুনয়ের সুরে বলল, 'এক শিশি আলতা মা-লক্ষ্মীর জন্যে নিন না কর্তা। খুব ভালো আলতা। পায়ের হাজা ফাটা নষ্ট হয়—'

বললাম, 'আলতার গুণাগুণ আমার জানা আছে। কিন্তু এখন কোন দরকার নেই। তুমি সামনে এগিয়ে দেখ।'

লোকটি বলল, 'নিন না বাবু, বাজারের চেয়ে সস্তা দিচ্ছি। বার আনা করে শিশি। মা-লক্ষ্মী শখ করে যেদিন পরবেন দেখবেন ঠিক একেবারে পদ্মফুলটি ফুটে রয়েছে। কথায় আছে না বাবু চরণকমল। মা জননীরা যখন আলতা পরেন তখন তা বোঝা যায়। জুতো বলুন, স্যাণ্ডেল বলুন, আব কিছুতে তা হয় না বাবু।'

লোকটির কবিত্বে আকৃষ্ট হয়ে বললাম, 'আচ্ছা দাও এক শিশি।'

'ফটিক, আলতা ফিরি করতে তুমি এই পাইকপাড়ার দিকেও আস নাকি আজকাল ?'

আমার বন্ধুর কথায় লোকটি চমকে উঠে বলল, 'কে ? কে কথা বলছেন ওখানে ?'

বললাম, 'আমার বন্ধু বিমল মুখুজ্যে। বিমল, তুমি ওকে চেন নাকি ?'

আলতাওয়ালা এতক্ষণ বিমলকে দেখেনি। যেখানে সে দাঁড়িয়ে ছিল সেখান থেকে ইজিচেয়ারে আধশোওয়া বিমলকে দেখবার জো ছিল না। কিন্তু সে এবার সোজা হয়ে বসতে দু'জনের চোখাচোখি হল।

ফটিক একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলল, 'ছোটকর্তা, আপনি এখানে ?'

বিমল বলল, 'আমি এদিকে মাঝে মাঝে আসি। তোমারও এদিকে যাতায়াত আছে দেখছি। তা তোমার আলতা কেমন চলছে ? নাম সেই সুহাসিনীই আছে, না ?'

ফটিক বলল, 'আর কেন লজ্জা দেন কর্তা ?'

বিমল এবার অপ্রতিভ হয়ে বলল, 'না না, লজ্জার কি আছে। আমি সেসব ভেবে ও-কথা বলিনি ফটিক। তুমি কিছু মনে করো না।'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেটটি বের করে বিমল ফটিকের হাতে দিতে গেল। ফটিক খুশী হয়ে বলল, 'আমরা কি সিগারেট খাওয়ার মানুষ কর্তা। একটা বিড়ি থাকে তো দিন।'

বিমল বলল, 'হয়েছে হয়েছে, নাও।'

এবার আমি লোকটির দিকে তাকালাম। বছর চল্লিশ বিয়াল্লিশ হবে বয়স। রোগা চেহারা, রংটা খুবই কালো। গায়ে একটা ছিটের হাফ শার্ট। কাঁধে ঝোলানো ব্যাগের মধ্যে আলতার শিশি, সাবান, স্নো, পাউডারের কৌটো। যেমন আরো পাঁচজন ফিরিওয়ালার থাকে তেমনি। লোকটির চেহারার মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্য আছে বলে আমার মনে হল না। কিন্তু বিমলের সঙ্গে ওর কথা বলার ভঙ্গিতে এক গোপন রহস্যের আভাস পেলাম।

আলতার দাম নিয়ে লোকটি চলে যাওয়ার পর আমি বন্ধুকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ব্যাপার কি। তুমি ওকে চেন নাকি ?'

বিমল বলল, 'বাঃ চিনব না কেন, ফটিক দাস আমাদের পাশের গাঁয়ের লোক। পার্টিশনের পরে একই সঙ্গে আমরা দেশ ছেড়েছি। এখন ও অবশ্য পাতিপুকুর কলোনীতে আছে। আর আমি কালীঘাটের মনোহরপুকুরে। তা হলেও ওর সব খবরই আমি রাখি। জানো কল্যাণ, এই সুহাসিনী তরল আলতার মধ্যে একটি গল্প আছে। আলতা তরল হলেও গল্পটি একেবারে তরল নয়।'

'কিসের গল্প বিমলবাবু ?'

ট্রেতে করে দু' কাপ চা নিয়ে রেখা ঘরে এসে ঢুকল।

বিমল বলল, 'আপনার জন্যে এক শিশি আলতা রাখলুম আমরা: সেই গল্প। শিশির আলতা আপনার, কিন্তু শিশির গল্পটি কল্যাণের : তা আপনার শোনবার যোগ্য নয় বউদি।'

রেখা হেসে বলল, 'আপনারা যদি বলতেই পারলেন আমার শোনায় কি দোষ।'

বলে রেখা তক্তপোশের এক কোণে বসে পড়ল। বিমলকে ইতস্তত করতে দেখে আমি বললাম, 'তুমি বলে যাও। রেখা না হয় মনে মনে কানে আঙ্গুল দিয়ে থাকবে।'

আর একটু অনুরোধ উপরোধের পর বিমল বলতে শুরু করল।

"ফটিকের বাড়ি ছিল আমাদের পাশের গ্রাম চণ্ডীপুরে। ওর বাবা ধোপার ব্যবসা করত। নাম লিখত সুবল ধুপী। কিন্তু ফটিক বোর্ড স্কুলে ঢুকেই নিজের পদবী পাল্টে লিখতে লাগল 'দাস'। বোর্ড স্কুল থেকে পাশ করে এম ই স্কুলেও ঢুকেছিল। কিন্তু বছর দুই বাদে ওর বাবা মারা যাওয়ায় ওকে পড়া ছাড়তে হ'ল। সবাই বলল, 'জাত ব্যবসা' ধরো। কিন্তু বাপের পদবীর মত বাপের পেশাও ফটিকের মনঃপূত হল না। ও ভবঘুরে হয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়াতে লাগল। গাঁয়ের লাগা যে গঞ্জ আছে সেখানেও মাঝে মাঝে ও থাকে। তবে ওর জীবিকার কিছু ঠিক থাকে না। কখনো দেখি লতিফ সিকদারের দর্জির দোকানে ও মেশিন চালাচ্ছে, কখনো বা শশী দত্তের মুদিখানায় নারকেল তেল ওজন করছে। ওর মতির স্থির নেই, গতির স্থির নেই, গাঁয়ে গঞ্জে সবাই ওর নিন্দে করে। শোনা যায়, ওর স্বভাবচরিত্রও বিগড়েছে।

"পার্টিশনের পরে আমি যেবার সপরিবারে কলকাতায় এলাম দেখি ফটিকও আমাদের গাড়িতে উঠেছে। একা নয়, সস্ত্রীক। ওর

স্ত্রীর সঙ্গে অবশ্য আমার স্ত্রীই আলাপ পরিচয় করল। তার কাছে শুনলাম, ফটিকের স্ত্রী বেশ সুন্দরী। বয়স খুব অল্প। চৌদ্দ পনেরর বেশি নয়। কি বয়সে, কি চেহারায় ফটিকের সঙ্গে ওকে মোটেই মানায়নি। আমার স্ত্রী একটি চলতি উপমার উল্লেখ করে বলল, 'বাঁদরের গলায় মুক্তার হার।'

"এ ক্যাম্প সে ক্যাম্প ঘুরে ফটিক গিয়ে ঘর বাঁধল পাতিপুকুরের কলোনীতে। ওই কলোনীতে বিষ্ণুপদ মিত্র নামে আমার এক বন্ধুও থাকে। তার বাড়িতে আমার যাওয়া-আসা আছে। সেই সূত্রেই ফটিকের সঙ্গে আমার ফের দেখা-সাক্ষাৎ হল। একদিন ফটিক আমাকে নিয়ে গেল তার বাড়িতে। ছোট্ট ঘর। টিনের চাল। বাঁশের বাখারির বেড়া। মাটির ভিত, সামনে এক ফালি বারান্দা। বারান্দার নীচে ছোট উঠোন। এক পাশে বেশ গাঁদা ফুল ফুটেছে। খানিকটা দূরে একটি তুলসী গাছ। ঘোমটা টানা একটি বউ এসে সেখানে একটি মাটির দীপ জ্বেলে দিয়ে গেল।

"বারান্দায় একটি টুল পেতে বসে খুঁটিতে ঠেস দিয়ে আমি ফটিকের সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করলাম। বললাম, 'যাক, তুমি এতদিনে তাহ'লে সত্যিই গৃহস্থ হয়েছ ফটিক। করছ কি আজকাল। চাকরি বাকরি কিছু—' ফটিক হেসে বলল, 'চাকরি কোথায় পাব কর্তা. নিজেই একটা আলতা বের করেছি। ওগো, এক শিশি আলতা নিয়ে এসো দেখি। আর কর্তাকে একটু চা টা করে দাও।'

"হ্যারিকেনের আলোয় আলতার শিশিটা নেড়ে চেড়ে দেখে বললাম, 'বাঃ বেশ নামটি রেখেছ তো। সুহাসিনী তরল আলতা। সুহাসিনী নামটি কার।' ফটিক লজ্জিত ভঙ্গিতে হাসল, 'আমার পরিবারের। সবাই এই নিয়ে ঠাট্টা তামাশা করে। কিন্তু তামাশা করলে হবে কি কর্তা, ওর পয় আছে, আলতাটা চলেছে ভালো।'

"শুনলাম আলতাটা নিজের বাড়িতেই তৈরি করে ফটিক। তার

কাজে সাহায্য করে সুহাসিনী। শিশির মধ্যে আলতা ঢালে, ছিপি লাগায়, লেবেল লাগায়। আর ফটিক শহরের দোকানে দোকানে সেই আলতার শিশি পৌঁছে দিয়ে আসে। মাঝে মাঝে থলিতে ভরে নিজেও ফিরি করে বেড়ায়।

"ফটিকদা, আছ নাকি ফটিকদা—?"

"চব্বিশ পঁচিশ বছরের একটি যুবক উঠোনে এসে দাঁড়াল। আলাপে বাধা পড়ায় ফটিক যেন একটু অপ্রসন্ন হ'ল। বলল, 'আছি। আমরা একটা কথায় আছি পবন।' পবন তার অপ্রসন্নতা গ্রাহ্য না করে এগিয়ে এসে বলল, 'আমিও একটা কথা বলতেই এসেছি ফটিকদা। আমাদের আলতাটা বউবাজার স্টোর্সে এ মাস থেকে পাইকারীভাবে নেবে। বলে এসেছি, পরশু বেলা দশটায় একশ' শিশি ডেলিভারী দেব। আজ রাত থেকে সবাই মিলে হাত না লাগালে—'

"ফটিক বিরক্ত হয়ে বলল, 'আচ্ছা আচ্ছা, পরে এসে হাত লাগাস। এখন যা ঘুরে আয়। বললাম যে, একটা কথায় আছি—।'

"পবন হেসে বলল, 'আচ্ছা, তুমি তা হলে ওঁর সঙ্গে দরকারী কথাটা সেরে নাও। আমি ততক্ষণ বউদিকে সুখবরটা দিয়ে আসি।'

"আর কোনদিকে না তাকিয়ে পবন সোজা ঘরের মধ্যে ঢুকল। ফটিক বলল, 'হ্যারিকেনটা ঘরে নিয়ে যাও। এখানে আর আলোর দরকার হবে না। চাঁদের আলোতেই সব দেখা যাচ্ছে, কি বলেন কর্তা?'

"ফটিক নিজেই গিয়ে দোরের সামনে হ্যারিকেনটা রেখে এল।

"পবন অবশ্য বেশিক্ষণ দেরি করল না। খানিক বাদেই ঘর থেকে বেরিয়ে এল। যাওয়ার সময় বলে গেল, 'আমি ঘুরে আসছি।'

"ও চলে গেলে আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'ছেলেটি কে?'

"ফটিক বলল, 'পবন চক্রবর্তী। এই কলোনীতেই থাকে। দেশের ঘরদোর বিক্রি ক'রে শ' কয়েক টাকা সঙ্গে এনেছে। কিন্তু

নিজে এখনো ঘর তোলেনি, এখানে মাসী-বাড়িতে আছে। ওর ইচ্ছে আমার কারবারে অংশীদার হয়। কিন্তু আমি ওসব অংশ টংশের মধ্যে নেই। টাকা তুমি ধার দিয়েছ। সুদ সমেত ফেরত দেব। ব্যস ফুরিয়ে গেল। কিন্তু পবন নাছোড়বান্দা। লজ্জা শরম, মান অপমান বোধ নেই। না ডাকলেও আসে।'

ডাকটা ফটিকের কাছ থেকে না এলেও অন্য কোন দিক থেকে যে আসে না তা আমার মনে হলো না। কারণ পবন বেশ স্বাস্থ্যবান, সুপুরুষ। বেশেবাসে শৌখিনভাব ছাপও দেখলাম। গায়ে তেরছি কলার পাঞ্জাবি, ঠোঁটের ওপর বাটারফ্লাই গোঁফ। ও যতক্ষণ ঘরে ছিল লজ্জাবতী সুহাসিনীর মৃদু মধুর হাসি আর কথা আমার কানে যাচ্ছিল।

"আসবার সময় আমিও ফটিককে পরামর্শ দিয়ে এলাম। ভাগের কারবারে যেন সে না যায়।

"ফটিক বলল, 'আমাকে শেখাতে হবে না কর্তা। আমি খুব সাবধান আছি।'

"কিন্তু সাবধান থেকেও বিশেষ সুবিধে করতে পারল না ফটিক। বছর দেড়েক বাদে বিষ্ণুপদর বাড়িতে গিয়ে শুনলাম, মাস দুই আগে পবন সুহাসিনীকে উড়িয়ে নিয়ে গেছে। সেদিনের ভাব-ভঙ্গি দেখে আমি এই রকমই খানিকটা আশঙ্কা করেছিলাম। বিষ্ণুপদ বলল, বউটা হয়ত একেবারে পালিয়ে যেত না। কিন্তু শেষের দিকে ফটিক ওকে বড়ই জ্বালাযন্ত্রণা দিত। মারধরও করত বলে শুনেছি। তাছাড়া ফটিকেরও গোড়া থেকেই দোষ ছিল। জাত ভাঁড়িয়ে ও কায়েতের মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছিল। সুহাসিনী নিজের মুখেই স্বীকার করেছে।'

"বললাম, 'ওসব কথা রেখে দাও। ফটিক না হয় জাতই ভাঁড়িয়েছিল। নিজের চেহারা, বয়স, বিদ্যা-বুদ্ধি তো আর ভাঁড়াতে পারেনি। গোড়াতে সুহাসিনী কি দেখে ভুলল।'

"বিষ্ণুপদ বলল, 'তা বলতে পারব না। ভোলবার যখন বয়স আসে, তখন কিছু না দেখেও মেয়েরা ভোলে। তারপর ভুল ধরা পড়লে ফের ভুলতে ভোলাতে সাধ যায়।'

"শুনলাম ঘর তালাবন্ধ করে ফটিক বিবাগী হয়েছে। আরো মাস কয়েক বাদে বিষ্ণুপদর সঙ্গে দেখা হ'তে সে নতুন খবর শোনাল। ফটিক আবার বিয়ে করে ঘরের তালা খুলেছে। এবার আর অসবর্ণা নয়, স্বজাতের একটি মেয়েকেই বিয়ে করেছে ফটিক। রাণাঘাটের ক্যাম্পে আধপেটা খেয়ে শুকিয়ে মরছিল সুখদা। ফটিক তাকে নিয়ে এসেছে। বয়স সাতাশ আঠাশ। সুখদার আগেও একবার বিয়ে হয়েছিল। গুটি দুই ছেলে মেয়েও হয়েছিল। কিন্তু তারা সব গেছে। ফটিকের এই অনাচারে কলোনীসুদ্ধ লোক ক্ষেপে উঠেছিল। কিন্তু সেক্রেটারী বিষ্ণুপদ মিত্র আর তার কমিটি সবাইকে বুঝিয়ে শুনিয়ে শান্ত করেছে। কালীঘাটে হিন্দু মিশনে গিয়ে বিশুদ্ধ শাস্ত্রমতে বিধবা বিবাহ করেছে ফটিক। বিষ্ণুপদ নিজে তার সাক্ষী আছে।

"মাস ছয় বাদে একদিন বিষ্ণুপদর খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি সে বাসায় নেই। কলোনীতে দু'নম্বর চেনা মানুষ ফটিক। ভাবলাম, তার একবার খবর নিয়ে যাই।

"আমাকে দেখে ফটিক সাদর সম্বর্ধনা জানাল, 'আসুন ছোটকর্তা, আসুন, আপনি আপনার বন্ধুর বাড়িতে আসেন যান, কিন্তু আমার এখানে ভুলেও একবার পায়ের ধুলো দেন না। শত হলেও দেশ-দেশী মানুষ। চোখের দেখা দেখতে প্রাণ তো আমারও চায় কর্তা।'

"বললাম, 'সময় ছিল না ফটিক। না হলে সেদিনই আসতাম।'

"ফটিক বলল, 'আমি আরো ভেবেছিলাম, আপনি বুঝি ঘেন্নায়—

"বললাম, 'দুর দুর। ঘেন্নার কি আছে। তুমি তো ভালো কাজই করেছ।'

"ফটিক উৎসাহিত হয়ে বলল, 'আপনিই বলুন, ভালো কাজ

করিনি ? যে বউ ইচ্ছা করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল, আমি যদি তার জন্যে বিবাগী হয়ে বেড়াতাম, কি সেই কুকুরটার সঙ্গে কামড়াকামড়ি করতাম, তা কি বুদ্ধিমানের কাজ হ'ত। তার চেয়ে কলোনীসুদ্ধু লোক জানুক, ফটিক মরদের বাচ্চা। সে এক বউ পালালে আর এক বউ ঘরে আনতে জানে। ঝড়ে যদি ঘর উড়িয়ে নিয়ে যায়, মানুষ বাঁদরের মত গাছে চড়ে থাকে না, আবার মাটিতেই সুখের ঘর বাঁধে কর্তা।'

"বললাম, 'তা তো ঠিকই। তা তোমার এ বউ কাজকর্মে বেশ—'

"ফটিক আমার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল, 'বেশ ভালো, বেশ ভালো কর্তা। আগেরটা ছিল বাবু। কেবল নিজের শাড়ি-চুড়ি, তেল-সিঁদুরের দিকে লক্ষ্য। কিন্তু এটি একেবারে পাকা গিন্নী। সংসার করতে জানে। এক সংসার করে এসেছে তো।'

"বলতে বলতে প্রসঙ্গ পালটে ফেলল ফটিক। বলল, 'দেখুন বাড়িঘরের চেহারা। কি রকম কুমড়ো ফলিয়েছে দেখুন। ওগো, বউঠাকরুনের জন্যে ভালো দেখে একটা কুমড়ো কেটে দাও তো ছোটকর্তার হাতে।'

"চেয়ে দেখলাম, উঠোনের চারদিক জুড়ে কুমড়োর মাচা। তাতে ছোট-বড় কয়েকটি কুমড়ো ঝুলছে।

স্বামীর আদেশে একটি কালো বেঁটে মোটাসোটা বউ ঘোমটা টেনে দা হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে এল। ফটিক তার হাত থেকে দা'খানা নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আমিই কেটে দিচ্ছি, তোমার নাগাল পেতে কষ্ট হবে। তুমি ছোটকর্তাকে এক গ্লাস চা করে দাও। চা করা শিখিয়ে নিয়েছি কর্তা। একদিনের বেশি সময় লাগে নি। সব পারে। ভারি বুদ্ধিমতী।'

"এত প্রশংসায় লজ্জা পেয়েই বোধ হয় বউটি তাড়াতাড়ি ঘরের মধ্যে গিয়ে লুকোল।

"একটু বাদে কুমড়ো পেড়ে নিয়ে এল ফটিক। সুখদা শাড়ির আঁচল দিয়ে গরম চায়ের গ্লাস ধরে আমার সামনে রেখে গেল। তাকিয়ে দেখলাম, আগের চেয়ে ঘরদোর বেশী পরিপাটি হয়েছে ফটিকের। উঠোনটি গোবর দিয়ে নিকোন। বারান্দাটিও বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। পাতায় ঢাকা তুলসী গাছটি আগের চেয়ে বেশী সতেজ। সুখদা ফটিককে সুখেই রেখেছে, তাতে কোন সন্দেহ নেই।

"বললাম, 'তোমার সেই আলতার ব্যবসা আছে নাকি ফটিক?'

"ফটিক বলল, 'আছে কর্তা। না থাকলে খাই কি। ভুলেই গিয়েছিলাম। ভালো কথা মনে করিয়ে দিলেন। ওগো এক শিশি স্যাম্পল দাও দেখি কর্তাকে।'

"আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'না না না।'

"ফটিক বলল, 'ভালো আলতা। নিয়ে যান কর্তা। বউঠাকরুন পরে খুশী হবেন।'

"সুখদা এক শিশি আলতা বারান্দায় নামিয়ে রেখে চলে গেল।

"আমি শিশিটির দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বললাম, 'সেই নামই রেখেছ দেখছি। সেই সুহাসিনী তবল আলতাই রয়ে গেছে।'

"ফটিক লজ্জিত হয়ে মুখ নামাল। একটু বাদে আমার দিকে ফের তাকিয়ে করুণ সুরে বলল, 'আমার দুঃখের কথা আর বলবেন না কর্তা।'

"কৌতূহলী হয়ে বললাম, 'কি রকম?'

"ফটিক বলল, 'আমার কপালে লেখা আছে কর্তা, নিত্য তিরিশ দিন একটা নষ্ট মেয়েমানুষের নাম নিয়ে আমাকে পেটের খোরাক জোগাতে হবে। নইলে এমন হয়? সে হারামজাদী পালিয়ে যাওয়ার পর আলতাটার নাম পালটে প্রথমে দিয়েছিলাম লক্ষ্মী আলতা। ঠাকুর দেবতার নাম; কিন্তু আলতাটা চলল না।

পাইকারের দোকানে সবগুলি শিশি পড়ে রইল। আবার লেবেল পালটে আমার সতীসাধ্বী বউয়ের নাম দিলাম। করলাম সুখদা আলতা। পাইকার তো কর্তা রেগেই আগুন। বলে, খেলা পেয়েছ? জালজুয়াচুরি পেয়েছ?'

"হেসে বললাম, 'তারপর?'

"ফটিক বলল, 'তাকে তো সব কথা খুলে বলা যায় না কর্তা। কিল খেয়ে কিল হজম করলাম। কিন্তু খালি পেটে কিল কর্তা ক'দিন সয় বলুন তো! আলতার শিশিগুলি সব যখন ফেরত দিল পাইকার, আমাকে বাধ্য হয়ে ফের সেই নষ্ট মেয়েমানুষটার নাম বসিয়ে দিতে হল। পাইকার খুশী হয়ে বলল, তোমার মালটা আবার চলছে হে। তোমার সুহাসিনী নামের পয় আছে। কাণ্ড দেখুন কর্তা, এই সতী-সাবিত্রীর দেশে পয় হল কি না—।'

"আলতার শিশিটি জোর করেই আমার পকেটে ভরে দিল ফটিক। কিছুতেই দাম নিল না। কুমড়োটা হাতে নিয়ে সে আমাকে রাস্তার মোড়ে বাস-স্টপ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে এল।

"হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা সুহাসিনীরা কোথায় গেল। তুমি বোধ হয় আর খবরটবর কিছু জানো না?'

"ফটিক বলল, 'জানব না কেন কর্তা, সব জানি, সব খবরই রাখি। বেলেঘাটার ফুলবাগান বস্তীতে আছে দু'জনে। পবন এ-ব্যবসা সে-ব্যবসা করে সব খুইয়ে শেষে একটা চামড়ার কারখানায় ঢুকেছে। জাতে বামুন হলে হবে কি, যেমন মতি তেমন তো গতি হবে ছোটকর্তা।'

"বললাম, 'তা তো ঠিকই। আলতার ব্যবসা আর করেনি, না?'

"ফটিক বলল, 'ও নাকি করতে চেয়েছিল, কিন্তু সুহাসিনী বাধা দিয়েছে। বলেছে, ওসব আলতাটালতার মধ্যে আমি আর নেই। আমাদের এই কলোনীর পটল সরকার পবনের বন্ধু। তার যাতায়াত আছে সেখানে। তার কাছে একটা খবর পেলাম কর্তা।'

"জিজ্ঞাসা করলাম, 'কি খবর ?'

"ফটিক বলল, 'সত্যিই কর্তা, পটল মানুষটি খাঁটি। তাছাড়া সে আমার গায়ে হাত দিয়ে বলেছে, মা কালীর নামে দিব্যি করে বলেছে। তার কথা অবিশ্বাস করতে পারিনে কর্তা। পবন নাকি অন্য আলতা কিনে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু সে হারামজাদী বলেছে, আমার নামের আলতা যখন বাজারে চলেছে, আমি সেই আলতাই পরব। পবন তো পায়ের জুতো হয়ে আছে কর্তা। তার কি আর অন্য কিছু করবার জো আছে ?'

"বাস এসে দাঁড়াল। ফটিক কুমড়োটা আমার হাতে তুলে দিতে দিতে বলল, 'কাণ্ড দেখুন কর্তা। হারামজাদী সিঁদুরের সম্পর্ক মুছে ফেলে আলতার সম্পর্কটুকু বজায় রেখেছে।'

"কপালের ঘাম মুছবার ছলে ভিজে চোখ দুটিও মুছে ফেলল ফটিক। আমি চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বাসের হ্যাণ্ডেল ধরলাম।"

গল্প শেষ ক'রে বিমল রেখার দিকে তাকিয়ে বলল, "ভেবে দেখুন, এ আলতা এখন পরবেন কি পরবেন না।"

রেখা টেবিলের ওপর থেকে চায়ের কাপ আর আলতার শিশি তুলে নিয়ে ভিতরে যেতে যেতে মুখ ফিরিয়ে ভ্রূভঙ্গি করে বলল, "যান।"

আমরা সিগারেট ধরালাম।

ঘর

উমা আর তার শাশুড়ীর অনুরোধে আভা শেষ পর্যন্ত আরো একটা দিন তাদের বাসায় থেকে যেতে রাজী হোলো। দোসরা জুলাই ওর স্কুল খুলবে। আর মাত্র দিন চারেক আছে মাঝখানে। আভা বলেছিল 'সিঁউড়িতে গিয়ে হোস্টেলের ঘরখানা গুছোতেও তো দু'দিন লাগবে।'

উমা বলেছে 'তোর আবার ঘর—তার আবার গুছোন। একটা বিছানা, একটা ট্রাঙ্ক আর একটা বইয়ের র‍্যাক, এই নিয়ে তো তোর সংসার।'

আভা হেসে বলল, 'সে সংসারে যে কি শান্তি তাতো বুঝলিনে। নিজে এই জবরজং সংসারের মধ্যে আছিস বলে ভেবেছিস সুখী হওয়ার আর কোন পথ নেই। আমার সেই এক ঘরের সংসারে আনন্দ বড় কম নেই।'

সেই নিঃসঙ্গ একখানা ঘরের আনন্দ থেকে বন্ধুটিকে সরিয়ে এনে তাকে বাসর ঘরের আনন্দের স্বাদ দেওয়ার জন্যে উমা বহুকাল ধরে চেষ্টা করছে কিন্তু আভা কিছুতেই রাজী হয়নি। সে চিরকুমারী থাকবে একথা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব সবাইকেই জানিয়ে দিয়েছে। সে কথা এতদিনে তারা মেনেও নিয়েছে। কারণ গত ফাল্গুনে সাতাশ উত্তরে আঠাশে পড়েছে আভা। বয়সের চিহ্ন চোখে মুখে পড়তে শুরু করেছে। মাস্টারি করে করে কেমন একটা রুক্ষতা এসেছে চেহারায়। এর পরেও কি বাঙালী মেয়ের আর বিয়ে হয়? সবাই ওর সম্বন্ধে আশা ছেড়ে দিয়েছে। ওর নিজের দাদারা পর্যন্ত আর বিয়ের জন্য চেষ্টা করে না। এ নিয়ে তাদের সঙ্গে আভার ঝগড়া-ঝাঁটি মনান্তর মতান্তর যথেষ্ট হয়ে গেছে। এখন নিজেদের মধ্যে একটি বোঝাপড়ায় এসেছে তারা। কিন্তু অবুঝ উমার পাগলামির সীমা নেই। সে এই

নিয়ে এখনো চিঠিপত্র লেখে। বিয়ে করার জন্যে অনুরোধ উপরোধ করে। আভা জবাবে লেখে, তোর ছেলের ঘরে নাতি হোক। সেই ক'টা দিন তুইও ধৈর্য ধরে অপেক্ষায় থাক, আমিও প্রতীক্ষা করি।

ব্যাপারটা প্রায় সেই রকমই দাঁড়িয়েছে। বড় ছেলে রঞ্জু দশ উতরে এগারোয় পড়েছে। শেষ পর্যন্ত রঞ্জুর ছেলেকেই বোধ হয় আভার বিয়ে করতে হবে।

তবু খোঁজ খবর ক'বে উমা একজনকে জুটিয়েছিল। বিমল ঘোষ উমাদেরই দূর সম্পর্কের আত্মীয়। তেত্রিশ চৌত্রিশ। স্বাস্থ্য ভালো। টেলিগ্রাফ স্টোর অফিসে সিনিয়ার গ্রেড ক্লার্ক। পাকা চাকরি। সংসারে নিকট আত্মীয় কেউ নেই। মেসে থাকে। সে এখনো আইবুড়ো আছে। তার সঙ্গে উমা সম্বন্ধ আনল আভার।

আভার ফটো তাকে দেখাল। উমার কাছে তার বান্ধবীর বিদ্যা-বুদ্ধি ও চাকরির বিবরণ শুনে বিমলও মোটামুটি পছন্দ করল।

উমা বলল আমার বন্ধুর বয়স একটু বেশি। তা নিয়ে আপনার কোন খুঁতখুঁতি নেই তো।

বিমল বলল, খুঁতখুঁতি কিসের। আমার বয়সও তো কম হলো না। ষোড়শী সপ্তদশী কাউকে বিয়ে করলেই বরং ভবিষ্যৎ খুঁতখুঁতির কারণ হয়ে থাকবে।

উমা মৃদু হেসে বলল, 'আপনার যেমন কথা।'

বিমলের কাছ থেকেও একখানি ফটো রাখল উমা। তারপর আভাকে চিঠি লিখে অনুরোধ করল গ্রীষ্মের ছুটিটা সে যেন তাদের ওখানে এসে কাটিয়ে যায়। আভা জবাবে লিখল কলকাতাটা গ্রীষ্ম যাপনের পক্ষে ঠিক যোগ্য নয়। উমাদের বাসা দাম্পত্য প্রেমে আরো উত্তপ্ত। তাই সে আপাতত দার্জিলিং যাচ্ছে। ফিরে আসবার পথে একবার উমাদের নীড় দেখে যাওয়ার ইচ্ছা আছে।

আভা বেশিদিন থাকবে না জেনে উমা প্রথম থেকেই তোড়জোড় শুরু করল। বিমলের ফটোখানা বন্ধুর হাতে দিয়ে বলল, 'দেখতো কেমন।'

আভা এক পলক তাকিয়ে বলল, 'সাধারণ আরো পাঁচজন বাঁঙালী ভদ্রলোকের মত। দেখতে কালো। লম্বাও নয়, বেঁটেও নয়। ভালোও নয় মন্দও নয় গোছের স্বভাব, কি বলিস; ঠিক বলিনি ?' হেসে বন্ধুর ফটোখানা ফিরিয়ে দিল আভা।

উমা তবু বিমলকে খবর দিয়ে এনে আভার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল। নাম ধাম পরিচয় থেকে শুরু করে দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে বিমলের সঙ্গে সহজভাবে প্রায় আধঘণ্টা আলোচনা করল আভা। তারপর নমস্কার জানিয়ে এক সময় উঠে এল, বিনীত ভাবে হেসে বলল, 'আমার একটু বেরোতে হবে।'

বিমল বলল, 'নিশ্চয়, নিশ্চয়। আশা করি আপনার সময় নষ্ট করিনি।'

আভা সৌজন্য জানিয়ে বলল, 'না না, সে কি কথা।'

বিমল চলে গেলে উমা সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে কেমন দেখলি।'

আভা বলল, 'সাধারণ আরো পাঁচজনের মত।'

উমা বিরক্ত হয়ে বলল, 'তুই কি আরো অসাধারণের খোঁজ করছিস ?'

আভা হেসে বলল, 'তুই ভুল করছিস উমা, আমি সাধারণ অসাধারণ কারোরই খোঁজ করছিনে। তুই নেহাতই অযথা ভেবে মরছিস।'

উমা রাগ ক'রে বলল, 'আমার শিক্ষা হয়ে গেল। আর তোকে কোনদিন কিছু বলব না।'

সুধীর স্ত্রীকে বলল, 'সত্যি এসব নিয়ে মিছেমিছি ওকে আর কেন বিরক্ত করছ ?'

আভা বলল, 'আমার জন্য ভাববেন না সুধীরবাবু। আমাকে বিরক্ত করবার ক্ষমতা ওর নেই। উমা নিজেই বিরক্ত হচ্ছে।'

ব্যাপারটা সেইখানেই শেষ হয়ে গেল। আভা এবার যাওয়ার কথা তুলল। উমা বলল, 'একটা দিন দেরি করে যা। আমি ভবানীপুর থেকে ঘুরে আসি।'

পদ্মপুকুব বোডে উমার দাদা শীতাংশু থাকে। তাব বড় ছেলের জন্মদিন। সেই উপলক্ষে বউদি এসে দিন কয়েক আগে নিমন্ত্রণ কবে গেছে। স্বামী ছেলে মেয়ে শাশুড়ী সবসুদ্ধ উমাব নিমন্ত্রণ। আভাকেও বলে গেছে সুরমা। গেলে খুব খুশী হবে।

আভা স্মিত মুখে বলেছে, থাকলে অবশ্য যেতাম। কিন্তু আমি ববিবাবেব আগেই সিউড়ি চলে যাচ্ছি।

উমাব জবরদস্তিতে শেষ পযন্ত যাওয়া আব হযে ওঠেনি। একটা দিন বেশি থেকেই যেতে হোলো।

সন্ধ্যা বেলায় চাবটি ছেলেমেয়েকে জামা জুতো পবিযে, নিজে শাড়ি গযনা পবে তৈবি হযে নিল উমা। সুটকেস থেকে স্বামীব ধোযা জামা কাপড় বের কবে দিল। তারপব বন্ধুব দিকে চেযে বলল, 'তুই চল আভা, বয়েই যখন গেলি। ভালো ভালো গাইয়ে আসবেন। আনন্দ ফুর্তি হবে। বাতটা সেখানে থেকে কাল ভোরে উঠেই আমরা সবাই মিলে চলে আসব। চল যাই।'

আভা মাথা নেড়ে বলল, 'না।'

'তাহলে সংসার ছেড়ে সন্ন্যাসিনী হয়ে একেবারে মঠে চলে গেলেই পারিস।'

আভা হেসে বলে, 'ভরসা হয়না ভাই। সেখানেও সন্ন্যাসীদের ভিড়।'

উমার শাশুড়ী যোগমায়াও যেতে পারলেন না। তাঁর শরীর ভালো নয়। ষাটের ওপর বয়স হয়ে গেছে। এখন আর বেশি নড়া

চড়া তাঁর সাজে না। তিনি তা পছন্দও করেন না। ভাল করে চোখে দেখতে পান না। রাত্রে অন্য কোন অচেনা যায়গায় থাকলে তাঁর অসুবিধে হয়।

সন্ধ্যার পর যোগমায়াব সঙ্গে খানিকক্ষণ বসে বসে গল্প করল আভা।

তিনি এক সময়ে বললেন, 'বিয়ে করলে না কেন মা?'

আভা বলল, 'এমনিই, সবাব কি সব জিনিস ভালো লাগে।'

যোগমায়া বললেন, 'সেকথা ঠিক, আজকাল দিন পালটে গেছে। মেয়েরাও বিয়ে না ক'বে থাকতে পারে, স্বাধীনভাবে চাকরি বাকরি ক'রে খেতে পারে, তাতে কোন নিন্দে হয় না। আমাদের কালে তো আর এসব সুবিধে ছিল না।'

আভা হাসল, 'তা হলে কি আপনি আমার মত বিয়ে না করে থাকতেন?'

যোগমায়া বললেন, 'কি জানি বাপু তখন কি মতি গতি হোত কি ক'বে বলব। তবে সংসাবে বড জ্বালা। যদি এর মধ্যে না ঢুকে পার তাহ'লে আব ঢুকোনা।'

আভা মনে মনে হাসল। কাল পুত্রবধূর সঙ্গে এই বৃদ্ধা মহিলার ঝগড়া হয়ে গেছে। উমাকে তিনি বলেছিলেন, আজ আবার আমাব জন্যে আলাদা ক'রে ডাল রাঁধলে কেন বউমা, রোজ রোজ ডাল ভাল লাগে না।

উমা বিবক্ত হয়ে বলেছিল, 'আপনার রুচির সঙ্গে আব পেবে উঠতে পাবলাম না মা। এইতো পরশু ডাল রাঁধিনি, কুরুক্ষেত্র কাণ্ড ক'বে ছাড়লেন। আজ রেঁধেছি আজ খাবেন কেন!'

কথায় কথায় আভাব সামনেই তুমুল ঝগড়া লেগে গেল। অফিসে যাওয়াব মুখে সুধীর স্ত্রীকে রাগ করল, মাকেও দুচারটে কড়া ধমক দিতে ছাড়লনা, 'তোমাদের জ্বালায় কি আমি বাড়ি ছেড়ে পালাব?'

সেই থেকে যোগমায়ার মনে দুঃখ আর অভিমান রয়েছে। শ্মশান বৈরাগ্যে সংসারকে অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হচ্ছে।

কিন্তু আভার বৈরাগ্য আরো গভীর। বাবার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে তার ম :আত্মহত্যা করেছিলেন সে কথা আভার স্পষ্ট মনে আছে। বাবা দাম্পত্য চুক্তি ভঙ্গ করেছিলেন। বড় বড় ছেলে মেয়ে থাকতে দু'বছর বাদেই ফের বিয়ে করলেন। সেই নতুন মা আভাব চেয়ে বয়সে বেশি বড় হবেন না। দাদারা সে কথা ভুলে বাবাকে ক্ষমা করেছে। কিন্তু আভা আর নিজেদের বাড়িতে সে ভাবে ফিরে যায়নি। গেলেও দু'দিনের বেশি টিকতে পারেনি। কলকাতায় চাকরি করতে হলে নিজেদের পরিবারে থাকতে হয়; আভা তাই কলকাতাকে বাদ দিয়ে মফস্বলের শহরে শহরে চাকরি নিয়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিয়ের কথা ভাবলেই তার মার কথা মনে পড়ে। তখন তার বয়স বছর চৌদ্দ। কিশোর মনে সেই দুর্ঘটনা যে দাগ কেটেছে তা কোন দিন মুছবার । সমস্ত পুরুষের মধ্যে আভা যেন নিজের স্বার্থপর অত্যাচারী বাপকে দেখতে পায়। অবশ্য এ দৃষ্টি যে বিকৃত তা আভা জানে। সকলের দাম্পত্য জীবন নষ্ট হয়ে যায় না। সুখে শান্তিতে অনেকেই ঘর-সংসার করে তাও আভা দেখেছে। তবু আভা'র বিয়েতে প্রবৃত্তি হয়নি। . । পড়বার সময়, বিভিন্ন স্কুলে চাকরি করতে গিয়ে যুবক প্রৌঢ় কত পুরুষের সঙ্গেই তো আভার আলাপ হয়েছে। কোন আলাপই প্রেমালাপে গিয়ে পৌঁছয়নি। বরং কোন কোন স্কুল কমিটির পিতৃতুল্য সেক্রেটারী এমন ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করেছেন যে আভাকে পালিয়ে আসতে হয়েছে। পুরুষ সম্বন্ধে আভার মনে কোন মোহ নেই, কোন স্পৃহা নেই। তাই আভা বিয়ে করতে রাজী হয়নি। অবশ্য অনেক সৎ হৃদয়বান, বুদ্ধিমান পুরুষের সান্নিধ্যে যে আভা না এসেছে তা নয়। অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্বও হয়েছে। তখন দেখা গেছে যাদের বুদ্ধিমান বলে মনে করেছিল তারা বোকা।

তরুণী নারীর স্বাভাবিক বন্ধুত্বকে অনুরাগের লক্ষণ বলে তারাও ভুল করে।

উমার মত অনেক আত্মীয় বন্ধু যেমন আভাকে বিয়ে করার জন্যে অনুরোধ উপরোধ করেছে, অনেক মেয়ে তেমনি আবার বিয়ে না করার জন্যেও তাকে অভিনন্দন জানিয়েছে। তাদের কেউবা আইনের সাহায্যে স্বামীর ঘর ছেড়েছে, কেউবা বে-আইনীভাবেই বেরিয়ে এসেছে। বহু অসুখী নারীর চিঠিপত্র এখনো আভার বাক্স দেরাজ খুললে পাওয়া যায়। তবু এসব বড় কথা । তারা অসুখী হয়েছে বলে যে আভা বিয়ে করে সুখী হতে পারবে না তার কোন মানে নেই। কিন্তু নিজের প্রবৃত্তি সবচেয়ে বড়। বিয়েতে সেই প্রবৃত্তিই নেই আভার। একজন পুরুষ তার জীবনের সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা একেবারে গাঁথা হয়ে রয়েছে, তার দেহ মন চিন্তা ভাবনার ওপর তার অবাধ অধিকার একথা ভাবতেই যেন অসহ্য লাগে, মাঝে মাঝে সেই অস্বাভাবিক অবস্থার কথা ভেবে হাসি পায়। বিয়ে করলে আভা হাসতে হাসতেই মারা যাবে।

দোতলার ছোট বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে আভা একখানা আধুনিক বাংলা উপন্যাস নিয়ে বসেছিল। কিন্তু দু'পাতা উল্টেই মুড়ে রেখেছিল বইখানা। কেবল প্রেম আর প্রেম। মৃদু হেসে নিজের মনেই মন্তব্য করেছিল আভা—অল্পবয়সী পাঠক পাঠিকাকে ভোলাবার পক্ষে বড় সহজ বিষয়-বস্তু। আভা কিন্তু সে বয়স পার হয়ে এসেছে। উপন্যাস বন্ধ করে নিজের জীবনের পাতাগুলিই অন্যমনস্কের মত আস্তে আস্তে উলটে যাচ্ছিল আভা; হঠাৎ যোগমায়ার ডাকে চমক ভাঙল, 'আর কতক্ষণ বারান্দায় বসে থাকবে মা, রাত হয়ে গেছে, এবার ঘরে এসো। ঘরেও তো আজ আর লোকজন কেউ নেই। এখানে বসেই পড়াশুনো করো এসে।'

লোকজন নেই। কিন্তু যোগমায়া একাই একশো। বড় বেশি

কথা বলেন তিনি। বুড়ো হলে যা হয়। তাঁর ভয়েই আভা বাইরে এসে বসেছিল। যোগমায়াব ডাকে ফোল্ডিং চেয়ারটা গুটিয়ে নিয়ে সে ঘরে চলে এল।

দু'খানা ঘরেব ফ্লাট। ঘবগুলি ছোট ছোটই। দুর্গাচরণ ডাক্তাব লেনের এই ফ্লাট বাড়িটায় বছর পাঁচেক ধবে আছে। ছেলে মেয়ের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় এই ছোট ছোট দু'টি ঘরে ওদেব আব কুলোয় না। কিন্তু না কুলোলেও বাধ্য হয়ে এব মধ্যেই উমাকে থকতে হয়। স্বামী একটি দেশী মার্চেন্ট অফিসে চাকরি করে। মাইনে শ'দেড়েকেব বেশি নয়। হয় টুইশন, না হয় পার্ট-টাইম কোন কাজ নিয়ে সুধীব সংসাবেব অভাব অনটনকে ঠেকিয়ে বাখতে চেষ্টা কবে। এ অবস্থায় বেশি ভাড়া দিয়ে বেশি ঘব নেওযার কথা ওবা ভাবতেই পারে না। বরং এতেই সংসাবের আয-ব্যয নিয়ে স্বামী স্ত্রীব মধ্যে মাঝে মাঝে তুমুল কলহ লেগে যায়। সে সব খববও আভা রাখে। যে উমা আজ তার বিয়ের জন্যে পীড়াপীড়ি কবছে, তখন সেও দুঃখ কবে চিঠি লেখে, 'তুই ভালো আছিস ভাই, বেশ স্বাধীন ভাবে আছিস।'

যোগমাযা জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাত কতক্ষণ হলো।'

দেযালেব পেরেকে নিজেব হাতঘড়িটা ঝুলিযে রেখেছিল আভা, দেখে বলল—'প্রায় নটা।'

যোগমায়া বললেন, 'তবে আব কি। খেয়ে দেয়ে এবারে শুযে পড়। আর বাত জেগে কি হবে। এর পরই তো আবার স্কুলেব খাটুনির পালা আছে। ছুটিব মধ্যে দেহকে দুটো দিন বিশ্রাম দাও। দেহই তো সম্বল। দেহে যতদিন খাটবার শক্তি থাকে, ততদিনই সংসারে মানুষেব আদব তারপব আর কেউ কারো নয়।

যোগমায়া বেশি রাত জাগতে পারেন না। জলটল খেয়ে সকালেই শুতে যাওয়া তাঁর অভ্যাস। কিন্তু আভা কিছু না খেলে তিনিও খাবেন না। তাই আভা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। উমা তার জন্যে

লুচি তরকারি তৈরী করে রেখে গিয়েছিল। বিধবা যোগমায়া গুড় আর খইয়ের ছাতু দিয়ে রাত্রের জল খাওয়া শেষ করলেন।

পাশাপাশি দু'খানা ঘর। বাইরের ঘরখানায় যোগমায়া বড় দু'টি নাতি আর একটি নাতনিকে নিয়ে থাকেন। ভিতরেরখানা উমাদের বেড-রুম। স্বামী আর দু'বছরের কোলের ছেলেটিকে নিয়ে উমা থাকে সে ঘরে। এই ক'দিন যোগমায়ার ঘরেই আলাদা বিছানা পেতে আভা শুয়েছে। রেণু আর টেনু শুয়েছে মার ঘরে। কিন্তু আজ যোগমায়া বললেন, 'তুমি উমার ঘরে গিয়েই শোও আভা। ও ঘরটা খালি পড়ে থাকবে কেন। না কি একা একা ভয় করবে তোমার?'

আভা হেসে বলল, 'ভয় করবে কেন, আমার তো একা থাকারই অভ্যাস।'

একাকিত্বকে নয়, একাকিত্বের অভাবকেই বরং ভয় করে আভা—সে কথাটা আর খুলে বলল না।

যোগমায়া বললেন, 'আলাদা বিছানা ক'রে কাজ কি, তুমি বরং উমার খাটেই শোও। পায়ের কাছে ধোয়া চাদর আছে ভাঁজ করা। আজই এসেছে ধোপা বাড়ি থেকে। তুমি ওটা পেতে নাও। না কি আমি পেতে দিয়ে যাবো?'

আভা মৃদু হেসে বলল, 'আপনাকে ব্যস্ত হতে হবে না। আপনি ঘুমোন গিয়ে। আমি সব ঠিক করে নেবো।'

আস্তে আস্তে দরজা ভেজিয়ে দিল আভা। উমার ঘরখানা আজ বেশ শান্ত নির্জন নিরালা হয়েছে। এই ক'দিন ছেলেমেয়ের গোলমালে, চীৎকারে আভা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। মুখ ফুটে কিছু না বললেও পালাই পালাই করছিল তার প্রাণ। উমা নেহাত তাকে জোর ক'রে ধরে রেখেছে। আজ একটু শান্তিতে থাকতে পারবে আভা।

ঘরের মধ্যে বৈদ্যুতিক আলো জ্বলছে। সেই আলোয় উমাদের

আসবাবপত্র স্পষ্ট দেখা যায়। উত্তর দিকের দেয়াল ঘেঁষা ডবল-বেড খাট। উমা বিয়ের সময় বাপের বাড়ী থেকে পেয়েছিল। অল্প দামের একটি ড্রেসিং টেবিল, এও বিয়েরই যৌতুক। তার পাশে একটা বইয়ের র‍্যাক্। এটা সুধীরের নিজের পয়সায় কেনা। ঘরের দেওয়ালে তিনটি তাক। নানা আকারের কৌটো আর বৈয়মে সেগুলি বোঝাই। পশ্চিম দিকের দেয়ালের কাছে গুটি দুই ট্রাঙ্ক, ছোট বড় দু'টি সুটকেস। খাটের নিচে গৃহস্থালীর জিনিসপত্র। হাঁড়ি-কুড়ি থেকে শুরু ক'রে আভার অনেক নাম না-জানা, ব্যবহার না-জানা জিনিস সেখানে স্থান পেয়েছে। আভা মনে মনে ভাবল এত জিনিসও উমার সংসারে লাগে! এই সিন্দুকের মত বোঝাই ঘরে ও দিনরাত থাকে কি ক'রে? ওর দম আটকে আসে না? আভার তো এই মিনিট কয়েকের মধ্যেই শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। না, এর চেয়ে তার যোগমায়ার ঘরেই শোওয়া ভাল ছিল। সে ঘরখানা এর চেয়ে অনেক ফাঁকা।

আভা এবার বিছানার দিকে তাকাল। দু'জোড়া বালিশ পাশাপাশি পাতা। আর একটি খুব ছোট বালিশ খানিকটা নিচের দিকে নামিয়ে পেতে রাখা হয়েছে। ও-টিতে উমার ছোট ছেলে টেনু ঘুমোয়। উমার কাণ্ড দেখ। বিছানাটাও ঠিক ক'রে রেখে যায়নি। আভা একবার ঘরের চারদিকে তাকাল। বাড়তি বালিশগুলোকে কোথায় চালান করা যায় ভেবে পেল না। যোগমায়ার ঘরে হয়ত রেখে দিতে পারে। কিন্তু তিনি এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছেন। তাঁর নাক ডাকার মৃদু শব্দ শোনা যাচ্ছে। বুড়ো মানুষের ঘুম ভাঙানো ঠিক হবে না। বালিশগুলির দিকে না তাকিয়ে আভা ধোয়া চাদরটা খাটের ওপর বিছিয়ে দিল। যেন তাতেই সব ঢাকা পড়ে গেছে। কিন্তু বিছানা তৈরী হলেও এত সকাল সকাল শোয়ার অভ্যাস নেই আভার। রাত জেগে পড়াটা তার বিলাস। এর জন্য অনেক

হোস্টেল সুপারিন্টেন্‌ডেন্টের বিরাগ ভাজন হতে হয়েছে। আভা সেই অসমাপ্ত উপন্যাসখানা নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনের চেয়ারটায় এসে বসল। কিন্তু উমা টেবিলটির কি ছিরি করে রেখে গেছে দেখ। আয়নার সামনে তো ওই একটুখানি জায়গা। সেখানে চিরুনি, সিঁদুর কৌটো, পাউডারের কৌটো, কাজললতা এমন কি টেনুর একটা রঙীন কাঠের বল পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। বৃথাই এই বার বছর গৃহস্থালী করেছে উমা, গোছগাছ কিছুই শেখেনি। এই টেবিলে বসে মানুষ পড়তে পারে!

বইখানা নিয়ে বিছানায় উঠে পড়ল আভা। এসে শুয়ে পড়ল। প্রেমে পরবার পর নায়িকার মনের অবস্থা কেমন হয়েছে লেখক পাতার পর পাতা তার বর্ণনা করে যাচ্ছেন। আভা বিরক্ত হয়ে ফের বই বন্ধ করল। দুত্তোরি, মেয়েদের মন আর তার বর্ণনা যেন অত সহজ!

বই বন্ধ ক'রে আভা ফের ঘরের চারদিকে তাকাল। শুধু দৃশ্য নয়, দম্পতিব ঘরের একটা গন্ধও আছে। কেমন যেন একটা অদ্ভুত গন্ধ। কোন ফুলের গন্ধ নয়, তেলের গন্ধ নয়, দু'জন মানুষের গায়ের গন্ধ নয়, সব মিলিয়ে এক বিচিত্র মিশ্রিত গন্ধ। একে কি পারিবারিক গন্ধ বলা যায়? আভা মনে মনে ভাবল। কোন দম্পতির শূন্য ঘরে শূন্য বিছানায় এমনভাবে রাত কাটানো আভার জীবনে এই প্রথম। ভেবে ভারি অদ্ভুত লাগল তার। রাত বাড়তে লাগল। কিন্তু কিছুতেই ঘুম এলো না। ডান দিকে পাশ না ফিরে সে দিকে না তাকিয়েও আভা অনুভব করতে লাগল আরো দু'টি বালিশ খালি পড়ে আছে। তারা আভার জীবনে চিরদিন খালিই পড়ে থাকবে। ছিঃ, এসব কি ভাবছে আভা। এ কি ভাবালুতায় পেয়ে বসল তাকে। দম্পতির পরিত্যক্ত ঘরে শুধু অদ্ভুত গন্ধই নেই ভূতের ভয়ও আছে। আগে জানলে আভা এঘরে শুতে আসত না।

রাত বেড়ে চলল। অনিদ্রায় অতিষ্ঠ হয়ে হঠাৎ এক সময় আভা

খাট থেকে নেমে পড়ল। ফের গেল ড্রেসিং টেবিলের কাছে। আয়নায় একটি সুন্দরী নারীর ছায়া পড়ল। সুডোল মুখ, আয়ত চোখ, টানা নাক, দুটি পাতলা আরক্ত ঠোঁট। মাথায় ঈষৎ কোঁকড়ানো চুলের ফাঁকে সরু সাদা সিঁথি। এ চেহারা যেন আভাব নয়, আর কারো। কিন্তু যারই হোক তার সৌন্দর্যে ক্ষয়ের ছাপ লেগেছে, অবসাদ আর ক্লান্তিব লক্ষণ দেখা দিয়েছে, একথা আব গোপন কববার জো নেই। আভা আয়না থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল। একটা ড্রয়ার খানিকটা খোলা। বোধ হয় চাবি নেই। কি খেয়াল হল আভার। সেটাকে বন্ধ না কবে একটু টেনে দেখল। নীল রঙেব খামে ভরতি একরাশ পুরোনো চিঠি। দেখলেই বোঝা যায় ওদের দাম্পত্য পত্র। কি খেয়ালে বেব ক'রে রেখেছে ওরাই জানে। হয়ত বিবাহ বার্ষিকী উপলক্ষে বের করেছিল। উমা তাকে একবাব লিখেছিল বিবাহ বার্ষিকীতে পুবোনো চিঠি পড়া তাদেব প্রোগ্রামেব অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সেই পুবোনো চিঠিব বাণ্ডিলের ওপবে সাদা কাগজেব একছত্র লেখা আভার চোখে পড়ল, 'উঃ, তুমি কি সত্যিই ভেবেছ বাগ ক'বে আমাব সঙ্গে কথা বন্ধ ক'বে থাকতে পাববে? সু।'

আভা তাড়াতাড়ি ড্রয়াবটি বন্ধ ক'বে ফের শুতে গেল। এবাব তাকে ঘুমোতে হবে। কাল সকালেই ট্রেন। আব বেশি বাত জাগলে দিনের কাজকর্ম সব পণ্ড হয়ে যাবে?

ঘুমোবাব জন্যে কেবল বাঁ কাত হয়ে শুয়েছে, পাশেব ঘব থেকে যোগমায়ার ঘুম জড়িত গলা শোনা গেল বউমা টাটু অমন কবে কাঁদছে কেন, ওকে ভালো করে শোয়াও, ওকে কোলে নিয়ে শোও।

আব কোন কিছু শোনা গেল না, তারপরই ফেব সেই নাকেব শব্দ। কিন্তু সে শব্দ আর আভার বেশিক্ষণ মনে বইল না। বাব বার তাব কানে বেতে লাগল, 'ও কাঁদছে কেন, ওকে কোলে ক'রে শোও।'

আস্তে আস্তে ডান দিকে পাশ ফিরল আভা। কোলের কাছে ছোট্ট একটু খালি বালিশ। হঠাৎ আভা উপুড় হয়ে সেই বালিশের মধ্যে নিজের মুখ গুঁজে ধরল। ধোপা বাড়ির ধোয়া চাদর ছাপিয়ে এক শিশুর চুলের গন্ধে সমস্ত বুক ভরে গেল আভার। চোখের জলে ভিজে গেল সেই বালিশ।

ভোর বেলায় সাতটার মধ্যে উমারা ফিরে এল। সুধীরের অফিস দশটায়। তার উদ্যোগ পর্ব আছে।

আভার দিকে তাকিয়ে উমা বলল, 'কিরে কাল রাত্রে ঘুমোসনি?'

আভা বলল, 'না তোর বিছানায় যা ছারপোকা।'

উমা বলল, 'মোটেই না, আমার বিছানায় মোটেই ছারপোকা নেই। তুই মিথ্যে কথা বলছিস।'

আভা প্রতিবাদ না করে বলল, 'তাহলে একটি সত্যি কথা শোন। আমি মত বদলেছি। বিমলবাবুকে আর একবার খবর দিতে পারিস।'

উমা উল্লসিত হয়ে বন্ধুকে আরো কি জিজ্ঞেস করতে গেল। কিন্তু আভা ততক্ষণে ঘর ছেড়ে পালিয়েছে।

ভাবি অপ্রস্তুত হয়ে পড়ল অরুণা। লজ্জার আর সীমা নেই। দাদার বন্ধুর হাতে চায়ের কাপটি কেবল ধরে দিয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত আলো নিভে সারা বাড়িটা একেবারে অন্ধকার হয়ে পড়ল। আর সেই অন্ধকারে অসাবধানে বীরেনের আঙ্গুলের সঙ্গে অরুণার আঙ্গুলগুলির একেবারে ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেল। সেই মুহূর্তেই অবশ্য হাতটা সরিয়ে নিয়ে এল অরুণা। কিন্তু মনে হোল আর একজনের হাতের স্পর্শটুকু তার সমস্ত আঙ্গুলের সঙ্গে যেন জড়িয়ে আছে। আর কেবল কি আঙ্গুলে?

অরুণা সেখানে আর না দাঁড়িয়ে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

বন্ধুর পাশে বসে শিশিরও চা খাচ্ছিল। বোনকে ডেকে নির্বিকার ভাবে বলল, রুণি, ঘর থেকে তাড়াতাড়ি হ্যারিকেনটা জ্বেলে আন তো।

বীরেন অন্ধকারেই চায়ের কাপে একটু চুমুক দিয়ে বলল, ব্যাপার কি, হঠাৎ কারেন্ট বন্ধ হয়ে গেল যে।

জানালা দিয়ে একটু তাকিয়ে বলল, সামনের বাড়িটায় তো দিব্যি আলো জ্বলছে। তোমার মেইনে কোন গোলমাল আছে নাকি?

শিশির করুণ স্বরে বলল, আর ভাই বল কেন। এ বাড়িতে আসা অবধি এই বৈদ্যুতিক বিভ্রাট চলেছে। অন্তত পনের বিশ টাকাও কি খরচ করিনি ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রীর পেছনে? টুকটাক কি করে দিয়ে যায়। দু'দিন ভালো চলে। ব্যস। তারপর আবার যা তাই। আমি অনেক লোক দেখেছি, কিন্তু এই ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রীগুলির মত এমন ফাঁকিবাজ আর দেখিনি।

বীরেন আর একবার চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে বলল, যা বলেছ।

শিশির আর একবার হাঁক দিল, কই রুণি, হ্যারিকেনটা দিয়ে গেলি না ?

কিন্তু হ্যারিকেনের বদলে অরুণা ত্ব'পয়সা দামের ছোট্ট একটি মোমবাতি জ্বেলে নিয়ে এল।

শিশির বলল, ওটা আর কতক্ষণ জ্বলবে। কেন হ্যারিকেনটা কি হোল ?

অরুণা মুখ নীচু করে মৃত্নস্বরে বলল, হ্যারিকেনে তেল ভরা নেই দাদা।

শিশিরের ক্ষৌরি হবার ছোট্ট কাঁচের বাটিটায় জ্বলন্ত মোমের কয়েকটা ফোঁটা ফেলে তার মধ্যে বসিয়ে দিয়ে টেবিলের উপর রাখল অরুণা। বারান্দার খানিকটা জায়গা তাতেই অবশ্য উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। কিন্তু আর সব অন্ধকার ঘরগুলোতে ততক্ষণে চেঁচামেচি শুরু হয়ে গিয়েছে। পাশের ঘর থেকে মা সুধাময়ী বকছেন, নাঃ, কি ভূতুড়ে বাড়ীর পাল্লায় পড়েছি। ও রুণি, এ ঘরে তোরা একটা আলো টালো কিছু দিবি ? না কি অন্ধকারে থাকব। ছেলেটা যে ভয় পেয়ে কেঁদে উঠেছে। তা কি তোদের কানে যায় না ?

শিশিরের ত্ব'বছরের ছেলে বিশু ঠাকুরমাকে জড়িয়ে ধরে সত্যই চেঁচাচ্ছিল। এদিকে রান্নাঘরে কড়াতে মাছের ঝোল চড়িয়ে দিয়েছিল শিশিরের স্ত্রী মিনতি। সদ্য পরিচিত বাইরের একজন লোকের সামনে চেঁচিয়ে ওঠাটা তার পক্ষে শোভন নয়। তার হয়ে চার বছরের মেয়ে লতুই ডেকে বলল, ও পিসীমা আলো দাও আমাদের, আমরা কি অন্ধকারে উন্নুনের আগুনে পুড়ে মরব ?

গলাটা লতুর হলেও বক্তব্যটা যে আসলে কার তা বুঝতে কারো বাকী রইল না। তিনজনের প্রত্যেকেই একবার করে প্রত্যেকের মুখের দিকে তাকাল।

অরুণা বলল, যাও দাদা কয়েকটা ক্যাণ্ডেল নিয়ে এস।

শিশির বিরক্ত হয়ে বলল, কি মুশকিল। জানিসই তো বাড়ীর ইলেক্‌ট্রিকের এই অবস্থা। আগে থাকতে দু'চারটে মোমবাতি আনিয়ে রাখতে পারিস নে ? সবই যদি আমাকে করতে হয়—

দাদার এ অভিযোগের অরুণা কোন জবাব দিল না। মুখ নীচু করে রইল। বীরেন আড়চোখে তাকাল সেই মুখের দিকে। মোমের মৃদু আলোয় ভারি নরম দেখাচ্ছে অরুণার মুখ। একটু লম্বাটে ধরনের গড়ন মুখের। নাক চোখ টানা টানা। রঙটিও বেশ ফরসাই। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের পক্ষে বেশ সুন্দরই বলা চলে। বয়স উনিশ কুড়ির কম হবে না। মুখের কচি মিষ্টি ভাবটুকু আছে বলে কিছু কম বলেই মনে হয়। পাতলা ছিপছিপে চেহারা। কিন্তু তাই বলে অপুষ্টাঙ্গী নয়। সাদা খোলের চওড়া কালো পেড়ে একখানা আটপৌরে শাড়িতে কোন মেয়েকে যে এত সুন্দর দেখায়, বহুকাল পরে বীরেনের তা যেন এই নূতন করে চোখে পড়ল। শিশির ততক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে, তুমি একটু বসো ভাই। মোড়ের দোকান থেকে আমি গোটাকত মোমবাতি নিয়ে আসি। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়া গেছে।

বীরেন একটু বাধা দিয়ে বলল, তার চেয়ে চলনা কেন তোমার মেইনটা একবার দেখে আসি। কি গোলমাল হয়েছে দেখাই যাক্‌ না।

বন্ধুর শৌখীন বেশবাসের দিকে তাকিয়ে শিশির মৃদু হাসল। সাজসজ্জার দিকে এখনো বীরেনের বেশ লক্ষ্য আছে। মাথার কালো মসৃণ একরাশ চুল সযত্নে ব্যাকব্রাশ করা। গায়ে সদ্য ইস্ত্রি ভাঙ্গা আদ্দির পাঞ্জাবি। বোতামগুলি অবশ্য সোনার নয়—হাড়েরই। কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়, বেছে শখ করে কিনেছে। চারদিকে নীল বর্ডার দেওয়া, মাঝখানে সাদা ছোট ছোট বোতামগুলি মানিয়েছেও বেশ। চওড়া কপাল, ভরাটে গাল, গলার পাউডারের সূক্ষ্ম আভাস একেবারে

অদৃশ্য নয়। ছেলেবেলা থেকেই একটু শৌখীন রুচির মানুষ বীরেন। সে শখটা আজও বদলায় নি। শিশিরের প্রায় সমবয়সী হলেও এখন আর তা মনে হয় না। মেজে ঘষে দু' তিনটে বছর অন্তত বেশ কমিয়ে এনেছে নিজের বয়সকে বীরেন। ছাব্বিশ-সাতাশের চেয়ে একটা দিনও বেশী বলে কেউ বিশ্বাস করবে না। বেশ আছে। সংসারে কেবল এক মা। এখনও বিয়ে থা করেনি। কোন ভাবনা চিন্তা নেই। আর এদিকে অল্প বয়সে বিয়ে করে দুই সন্তানের বাপ হয়ে তিরিশ বছরেই যেন বুড়িয়ে পড়েছে শিশির।

বন্ধুর মেইন সুইচ দেখে আসবার আগ্রহে শিশির তাই একটু হেসে বলল, থাক্ থাক্। আর বিদ্যে ফলিয়ে দরকার নেই। তোমার মত ফিট বাবু ওসব সুইচ ফুইচ দেখে কি করবে। নিরুপদ্রবে কলম পিষে যাচ্ছ, সেই ভালো। বৈদ্যুতিক ব্যাপারের মধ্যে গিয়ে কি দরকার? শেষে দারুণ একটা শক্ টক্ খাবে। মেইনে হাত দিতে গিয়ে আমার সেদিন কি হয়েছিল দেখ।

বন্ধুকে ডান হাতটা তুলে দেখালে শিশির। হাতে অবশ্য কিছুই এখন আর দেখা গেল না।

বীরেন সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছিল, শক্ খেয়েছিলে নাকি?

শিশির বলল, হ্যাঁ, ভারি লেগেছিল সেদিন। বীরেন মুচকে হাসতে লাগল।

অরুণাও হাসল, ভারি না আরো কিছু। অমন শক্ আমাদের কতদিন লাগে। এসব ব্যাপারে দাদার ভারি ভয়। সেই থেকে নিজে তো সুইচে হাত দেনই না, আমাদের কাউকেও যেতে দেন না কাছে।

বীরেন হেসে বলল, ইলেকট্রিসিটিকে তুমি বুঝি তেমন ভয় কর না? তুমি, বলেই যেন একটু সঙ্কুচিত হয়ে পড়ল বীরেন। পাঁচ-ছয় বৎসর পরে দেখা অরুণাদের সঙ্গে। এই কয়েক বছরে অনেক

অদল বদল হয়েছে। অরুণা তখন ছিল কিশোরী, রোগা লিকলিকে চেহারা। তখন 'তুমি' কেন 'তুই' বলতেও কোন সঙ্কোচ হোত না। কিন্তু এখন এই পূর্ণ-যৌবনা সুশ্রী তন্বীটিকে হঠাৎ 'তুমি' বলতেও যেন কেমন কেমন লাগে।

বীরেনের সামনে অতগুলি কথা বলে ফেলে অরুণাও ততক্ষণে বেশ একটু লজ্জিত হয়ে পড়েছে। বীরেনের 'তুমি' বলার সঙ্কোচটুকুও তার চোখে এড়াল না।

গেঞ্জিটা গায়েই ছিল। স্যাণ্ডেল পায়ে দিতে দিতে বোনকে বলল, শিশির, আমার পকেট থেকে আনা চারেক পয়সা নিয়ে আয় তো, নিয়ে আসি ক্যাণ্ডেল।

পয়সা দিতে অরুণা চলে গেল ঘরে। শিশির বেরিয়ে গেল মোমবাতি আনতে। অরুণাও তার পিছনে যেতে যেতে বীরেনের দিকে একবার তাকিয়ে বলল, আপনি বসুন, বউদি অন্ধকারে কি করছে দেখে আসি।

বীরেন বলল, তার চেয়ে এই মোমবাতিটাই তাঁকে দিয়ে আসুন না।

অরুণা মৃদু হেসে বলল, আর আপনি বুঝি একা একা অন্ধকারে বসে থাকবেন।

বীরেন বলল, একা একা থাকব কেন ?

তারপর একটু থেমে বলল, শিশির তো এখুনি আসবে। সত্যিই তাই। তিন চার মিনিটের বেশী দেরি হলো না শিশিরের। আধ ডজন মোমবাতি, আর দুটো সিগারেট নিয়ে সে তাড়াতাড়িই ফিরে এল। মোমবাতিগুলি বোনের হাতে দিয়ে বলল, যা এবার ঘরে ঘরে জ্বেলে দিয়ে আয়। একটু অন্ধকার হয়েছে কি, চ্যাঁচামেচিতে সব অস্থির। কারো যদি একটু ধৈর্য্য থাকে ? তারপর বন্ধুর দিকে সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বলল, ধরাও বীরু।

বীরেন দেশালাই জ্বেলে বন্ধুর সিগারেটটা আগে ধরিয়ে দিতে দিতে বলল, মোমবাতি তো তা'হলে একেবারে কম যায় না শিশির। এদিকে ইলেকট্রিক চার্জও দিতে হয়।

শিশির বলল, খুবই দিতে হয়। তারটারগুলো খারাপ হয়ে যাওয়ায় কারেন্ট বেশীই পোড়ে।

বীরেন সিগারেটের একটু ধোঁয়া ছেড়ে বলল, রিওয়্যারিং করে নিলেই তো পারো।

শিশির একটু হেসে বলল, যখন তখন আর পারি কই। এ অঞ্চলের একজন মিস্ত্রিকে ডেকে এনেছিলাম সেদিন। সে শ'খানেক টাকার এস্টিমেট দিল।

বীরেন বলল, বল কি, অত পড়বে কেন?

শিশির একটু হাসল, পড়ালে পড়বে না কেন?

তারপর ধীরে ধীরে সুখ-দুঃখের কথা বন্ধুকে বলতে লাগল শিশির। সুখের চেয়ে দুঃখের কথাই বেশী। বেলেঘাটার এই শহরতলীতে তিনখানা ঘরওয়ালা পুরোনো এই একতলা বাড়িটুকুর বাসিন্দা হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করতে কম বেগ পেতে হয়নি। বাড়িওয়ালা থাকেন টালিগঞ্জে। নিতান্তই পিতৃবন্ধু বলে নামমাত্র তিনশ' টাকা সেলামীতে আর পঞ্চান্ন টাকা ভাড়ায় আরো অনেক প্রার্থীকে মনঃক্ষুণ্ণ করে শিশিরকে তিনি বাড়িখানা ছেড়ে দিয়েছেন। এর উপর তিনি আর এ বাড়ির পেছনে পয়সা খরচ করতে রাজী নয়। মেরামত করাতে হয় শিশিরই করিয়ে নিক। তারপর ভাড়া থেকে না হয় ফি-মাসে টাকা পাঁচেক করে কাটিয়ে নেওয়া যাবে। এদিকে মার্চেণ্ট অফিসের কেরানীগিরি করে শিশিরের ভাতাটাতা ধরে এখনো পুরোপুরি দু'শোতে গিয়ে পৌঁছোয় নি। টাকা পনের কমই আছে। অথচ দেশের বাড়ির সবাইকেই কলকাতায় নিয়ে আসতে হয়েছে। খরচের সঙ্গে আর পেরে ওঠা যায় না। প্রত্যেক মাসেই ভাবে,

লাইনটা ঠিক করে নেবে। কিন্তু হয়ে ওঠে না। মাইনে পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রায় অর্ধেক টাকা আগের মাসের মুদি, কয়লা, ধোপাব হিসাব শোধ করতে জলের মত বেরিয়ে যায়। বিদ্যুতের পেছনে খরচ করবার মতো অবশিষ্ট কিছুই থাকে না। ফলে মাসের মধ্যে পনেব বিশ দিন বাড়িতে অমাবস্যা লেগে থাকে। কিন্তু উপায় কি?

সরল আন্তরিকতায় বন্ধুকে সব কথা জানাল শিশির। পাশাপাশি গ্রামে বাস। ছেলেবেলা থেকে একসঙ্গে পড়েছে। আগে খুবই যাওযা আসা ছিল। তাবপব মেট্রিকুলেশন পর পর দু'বছর ফেল করে বীবেন হঠাৎ উধাও হযে যায়। বছব পাঁচেক আগে একবার দেশে এসেছিল। দিন কয়েক ছিল ও শিশিবদেব বাড়িতে। এ গল্প সে গল্প। দেশ-বিদেশ অনেক ঘুবেছে। পড়াশুনো করবেই না ভেবেছিল। কিন্তু কি খেযাল হোল। পাটনা ইউনিভার্সিটি থেকে প্রথমে ম্যাট্রিক তাবপব আই এস সিটা শেষ পর্যন্ত পাশই করে বসল বীবেন। মামামামি আবো পড়বাব জন্য চাপ দিয়েছিলেন। কিন্তু শিশির তো জানে, পরেব চাপে বীরেনেব কোনদিন পড়া হয না। যেটুকু হয়ে বইল, সেটুকুই থাক। আবাব যদি কোনদিন বই নিযে বসতে ইচ্ছা হয় তখন দেখা যাবে।

ছ'বছব পবে আজ আবার খেলার মাঠে দেখা হয়েছে দুই বন্ধুতে। শিশিব একেবারে হাত জড়িয়ে ধবেছিল, আবে বিরু যে? কবে এলে কলকাতায়?

বীরেন শিশিরের মুখেব দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে জবাব দিয়েছিল, কবে এলে মানে? কলকাতায়ই তো আছি।

শিশির বলেছিল, কলকাতায় আছ, অথচ দেখাসাক্ষাৎ কিছুই কর না।

বীরেন পাল্টা অভিযোগ করে বলেছিল, তুমিই যেন কত করো, তা ছাড়া ঠিকানাই তো জানিনে। আর জানলেই বা কি। ঠিকানা

জানা কত বন্ধুর বাড়িতে দেখা করতে গিয়ে হতাশ হতে হয়েছে। কলকাতা শহরে এই নিয়ম। এখানে দেখা করা হয় না, দেখা হয়ে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকতে হয়।

ছেলেবেলা থেকেই খুব বাকপটু বীরেন। আর শিশির মুখচোরা। কোনদিনই ওর সঙ্গে কথায় পারে না। কিন্তু তাই বলে বন্ধুত্বের জবরদস্তি চালাতে শিশিরের জুড়ি নেই। জোর করেই বীরেনকে সে নিজের বাসায় ধরে নিয়ে এসেছে। কাজকর্মের নানা অজুহাতের কথা পেড়েও বীরেন বন্ধুকে নিবৃত্ত করতে পারে নি।

বাসে পিছনের দিকের বেঞ্চিটায় পাশাপাশি বসে শিশির জিজ্ঞাসা করছে, কি কর আজকাল? বীরেন হেসে জবাব দিয়েছে, আবার কি! সেই কেরানীগিরি? কোথায়?

একটা মাড়োয়ারী মার্চেন্ট আফিসে?

শিশির অসঙ্কোচে জিজ্ঞাসা করেছে, কি রকম হয়?

বীরেন হেসে বলেছে, না, তোমার সঙ্গে আর পারা গেল না। অমনিতে কোন কথা বলো না, কিন্তু যখন আরম্ভ কর, পেটের কথা তো ভালো, একেবারে নাড়িভুঁড়ি পর্যন্ত বের করে আনতে চাও। কি রকম আবার হবে? দিনকালের যা অবস্থা তাতে আমাদের মতো লোকের কোনরকম ছাড়া অন্য কোন-রকম আছে নাকি?

শিশির একটু অপ্রতিভ হয়ে চুপ করেছিল। কিন্তু যেভাবে সেজেগুজে বীরেন বেরিয়েছে, তাতে খুব খারাপ আছে বলে মনে হয় না। বিদায় নেওয়ার সময় আর একবার ইলেকট্রিক লাইটের কথা উঠলো।

শিশির বলল, সস্তায় করে দিতে পারে, জানাশোনা এমন মিস্ত্রী আছে নাকি কেউ?

বীরেন একটুকাল চুপ করে থেকে হেসে বলল, মিস্ত্রীর অভাব কি? কিন্তু কোন মিস্ত্রীতে তোমার বিশ্বাস নেই। এক কাজ করনা

যদি বল, কাল সকাল থেকে আমিই লেগে যাই তোমার বাড়ির লাইট ফিট করতে।

শিশির বলল, বল কি তুমি ?

শিশিরের স্ত্রী মিনতিও রান্না শেষ করে ততক্ষণে উঠে এসেছিল, হেসে বলল, আপনি লাইট ফিট করবেন, তবেই হয়েছে। বন্ধুর মত আঙুলে রবিক কম্প্রেস করে আপনাকেও তাহলে দিন তিনেক শুয়ে থাকতে হবে।

অরুণা বউদির দিকে ফিরে বলল, উনি না হয় দিন তিনেক শুয়ে কাটালেন। আমাদের ক'দিন অন্ধকারে কাটাতে হবে তার বোধ হয় ঠিক নেই বউদি। মনে আছে দাদার মিস্ত্রীগিরির কথা। মেইনটাকে এমনভাবে বিগড়ে দিয়েছিল যে, যদি বা এক-আধটু জ্বলত, দাদার হাত লেগে তাও বন্ধ হোল। ওঁর হাতের ছোঁয়া লাগলে বিদ্যুৎ নিশ্চয়ই একেবারে মেঘের কোলে লুকোবে।

বীরেন অরুণার দিকে তাকিয়ে একটু হাসল, তাই নাকি ? আমার হাতের ছোঁয়া বিদ্যুৎ জ্বলবে বা নিভবে তা তুমি জানলে কি করে ?

আরক্ত মুখে অরুণা তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলে।

বন্ধুর বোনের সেই লজ্জাটুকু উপভোগ করতে করতে বীরেন বন্ধুর দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু তুমি একেবারে মাটি করে রেখেছ শিশির। তোমার উপর এদের আর কোন আস্থা নেই, আর তোমার বন্ধু বলে আমিও এদের অনাস্থাভাজন হয়েছি। আচ্ছা ফলেন পরিচিয়তে। কালই সব দেখা যাবে। কিন্তু গোটা চল্লিশেক টাকা দিতে হবে যে শিশির।

শিশির বলল, টাকা, টাকা দিয়ে কি করবে ? বীরেন হেসে বলল, নিয়ে পালাব আর কি। মানে রিওয়্যারিং করতে হলে তোমার কয়েলখানেক হেনলি কেবল লাগবে। গোটা পাঁচ ছয় সুইচ, প্লাগ-পয়েন্ট, হোল্ডার সবই তো দরকার হবে। টাকা চল্লিশের মধ্যে আশা

করি সব কুলিয়ে যাবে। তারপর তোমার আর একটা পয়সা খরচ লাগবে না।

শিশির বিস্মিত হয়ে বলল, তা না হয় লাগল। কিন্তু সত্যি সত্যি তুমি পারবে তো? মিস্ত্রিগিরির তুমি জানো কি।

বীরেন বলল, আহা বিয়ে না করলেও বরযাত্রী তো বহুবার গেছি। পুঁথিগত বিদ্যা কিছু কিছু আছে এ সম্বন্ধে। একবার ইলেকট্রো ইঞ্জিনিয়ারীং পড়বার খেয়াল হয়েছিল। একবার এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখই না আমাকে দিয়ে। টাকা জলে যাবে না তোমার।

অরুণা শিশিরকে ইঙ্গিতে আড়ালে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, দাদা শোন, উনি যখন বলছেন অত করে, দিয়ে দাও টাকাটা। আসলে নিজে তো আর একা আসবেন না। একজন মিস্ত্রীটিস্ত্রী নিশ্চয়ই সঙ্গে করে আসবেন। তোমার সঙ্গে তামাশা করছেন।

শিশির বলল, কিন্তু এখন অত টাকা পাব কোথায়?

অরুণা একটু ভেবে বলল, বেশ আজ আমার কাছ থেকে নাও, মাসের প্রথম মাইনে পেয়ে দিলেই হবে।

পাড়ার গুটি দুই ছোট ছোট মেয়েকে মাস চারেক অরুণা পড়িয়েছিল। সেই বাবদ গোটাপঞ্চাশেক টাকা তার হাতে জমেছে। দাদার অর্থসঙ্কটের কথা উঠলেই সেই টাকাটা সে ধার দিতে চায়। শিশির প্রায়ই ঠাট্টা করে বলে, রাজার নেই যে ধন টুনির আছে সেই ধন। কিন্তু আজ বোনের দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হাসল শিশির, বলল, আচ্ছা দে, টাকাটা!

শিশিরের বুঝতে বাকি নেই—অরুণা এই ছলে বীরেনকে কাল আবার বাসায় আনতে চায়। আনাক। শিশিরেরও অমত নেই তাতে। পুরোন বন্ধু বীরেন চক্রবর্তী। শিশিরের চেয়ে বয়সে বোধ হয় বছর দুই ছোটই হবে। দেখতে আরো ছোট মনে হয়। চেহারা দেখে বছর পঁচিশেকের বেশী কেউ বলতে পারবে না। তা ছাড়া

রুণির বয়সও তো কম হোল না। পাত্রের সঙ্গে পাত্রীর বয়সের কিছু ব্যবধান থাকাই ভালো। শিশিররা চাটুয্যে। বীরেন কুলীন নয় বলে মা'র হয়ত একটু আপত্তি হবে। বুঝিয়ে শুনিয়ে ঠিক করলেই চলবে। আজকাল অত দেখলে চলে না। কই, কুলীনের সম্বন্ধ তো কতই এল। কোনটাই তো ঠিক দরে পটল না। তাদের তুলনায় দেখতে শুনতে বীরেন চক্রবর্তী ঢের ভালো।

পরদিন রিক্‌শায় মালপত্র চাপিয়ে সত্যিই এসে হাজির হোল বীরেন। পাঞ্জাবির বদলে গায়ে আজ একটা শার্ট চাপিয়ে এসেছে। তাতে আরো স্মার্ট দেখাচ্ছে তাকে, আরো যেন একটু ছোকরা ছোকরা।

শিশির বলল, ফর নাথিং তোমার আফিস কামাই হবে। বীরেন অরুণার দিকে তাকিয়ে চোখ ফিরিয়ে নিয়ে বন্ধুকে বলল, একেবারে ফর নাথিং হবে কেন? তাছাড়া মাঝে মাঝে অফিস কামাই করা আমার অভ্যাস আছে। রোজ রোজ গাধার খাটুনি খাটতে ভাল লাগে?

শিশিরের মনে পড়ল ছেলেবেলায় স্কুল পালাতেও বীরেনের জুড়ি ছিল না। আর এ ধরনের বেগার কাজে তার আবাল্যের উৎসাহ। একবার গোপাল ঘরামির সঙ্গে সঙ্গে থেকে শিশিরদের ছনের আট-চালাটা ছেয়ে দিয়েছিল বীরেন। ছুতোর বাড়িতে ওকে নৌকো গড়বার কাজে সাকরেদী করতেও দেখা গেছে। ওর সাধেরও সীমা নেই, সাধ্যেরও সীমা নেই।

শিশির বলল, আমি কিন্তু ভাই থাকতে পারব না, জরুরী কাজ আছে অফিসে।

বীরেন বলল, তোমাকে থাকতে বলেছে কে। শিশির মনে মনে হাসল—তা তো বটেই। কেবল শিশির কেন, বাড়িসুদ্ধু লোক বেরিয়ে গেলে বীরেন আর অরুণার সুবিধা হয়। বন্ধুর উপর অরুণার

পক্ষপাতিত্বের কথা ইতিমধ্যেই মিনতির মারফত কানে গেছে শিশিরের।

শিশির অফিসে যাওয়ার আগেই অবশ্য কাজ শুরু করে দিল বীরেন। তের চৌদ্দ বছরের একটি ছোকরাকে এনেছে সঙ্গে। নাম কানাই। ভারি চালাক চতুর। শিশির বলল, ওকে আবার কোত্থেকে জোটালে ?

বীরেন বলল, জোটালাম, আমাদের পাড়ারই এক ইলেকট্রিক মিস্ত্রীর ছেলে। মিস্ত্রীকে আর আনলাম না ; চার্জ অনেক বেশী। তার চেয়ে দেখি নিজেরাই খেটে-খুটে কি করা যায়।

খেয়েদেয়ে শিশির অফিসে বেরিয়ে গেল। বীরেন পুরনো তারগুলি খুলে ফেলতে লাগল একটা একটা করে। স্ক্রু ড্রাইভার, কাটিং প্লাস, ড্রিল মেশিন, ছুরি, ছোট্ট হাত-করাত, দেখা গেল সব সরঞ্জামই আছে কানাইর ঝোলায়। কেবল পাশের বাসা থেকে মই একটা জোগাড় করে দিতে হোল অরুণাকে। আর মাঝে মাঝে চা। শার্ট খুলে ফেলেছে বীরেন। কাপড় গুটিয়ে নিয়েছে মালকোঁচা করে। গায়ে শুধু একটা সাধারণ সাদা গেঞ্জি। গলার নিচে রোমশ বুকের আভাস চোখে পড়ে। ঘুরে ঘুরে বার বার মইয়ের নিচে এসে দাঁড়াতে লাগল অরুণা। কোন বাব চা, কোন বার পান। কোন বার বা শুধু হাতে। সাধারণ একটা গেঞ্জি গায়েও অদ্ভুত সুন্দব দেখাচ্ছে বীরেনকে। বার বার দেখেও যেন সাধ মেটে না।

মিনতি তেমন আলাপী নয়। তা ছাড়া লজ্জাও একটু বেশী। ফাই-ফরমাশ অরুণাকেই প্রায় সর্বদা খাটতে হোল। এদিকে বীরেনেরও ডাকাডাকির বিবাম নেই। জলচৌকিটা চাই, হাতুড়ি আছে নাকি বাড়িতে।

বসবার ঘরের পয়েন্টটা যেখানে আছে, সেখানেই থাকবে, না একটু পূবের দিকে সরিয়ে দিতে হবে, বলে যাক্ অরুণা।

মিনতি ছেলেকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে হেসে বলল, যাও ঠাকুরঝি বলে এসো।

হাসির ধরনটা ভালো নয় বউদির। অরুণা চটে উঠে বলল, আমি যেতে পারব না, তুমি যাও।

মিনতি আবার একটু হেসে বলল, আহা আমি গেলে কি আর আলো জ্বলবে।

অরুণা আরও রাগ করল, অমন যদি কর বউদি, আমি আর একটুও বেরুব না বলে দিচ্ছি।

মিনতি বলল, না ভাই, তাহলে ভারি বিপদে পড়ব। তুমি যদি না বেরোও, তাহলে বাইরেব লোকই হুট করে ঘরে এসে ঢুকবেন।

এর জবাবে প্রায় মিনিট পনেরো কুড়ি রাগ করে রইল অরুণা। কিন্তু তার বেশী থাকতে পারল না। বীরেন আবাব ডাকাডাকি শুরু করেছে। কই অরুণা, কোথায় গেলে? এই বাল্‌বটা একটু ধর, এসো দেখি।

অরুণা ফের গিয়ে মই-এর নিচে দাঁড়াল। সদরের দিকটায় কাজ করছে তখন বীবেন। কপালে একটু একটু ঘাম দেখা যাচ্ছে।

অরুণা বলল, ব্যাপার কি। মই-এর উপর থেকে বীরেন বলল, এই বাল্‌বটা একটু ধর।

অরুণা বলল, কেন আপনার সেই কানাই গেল কোথায়?

বীরেন হেসে বলল, কানাই নেই। তাকে পাঠিয়ে দিয়েছি।

ও-মা, তাকে আবার কোথায় পাঠালেন দুপুরে? আপনারা দু'জনেই তো খাবেন এখানে। বীরেন বলল, তাকে বিড়ি আনতে পাঠিয়েছি।

অরুণা বলল, ছি, বিড়ি খান বুঝি। কেন, আমাকে বললেই তো পারতেন, আমার কাছে টাকা ছিল। সিগারেট আনিয়ে দিতাম।

বীরেন বলল—আচ্ছা। জানা রইল। সিগারেট চাইলে তোমার

কাছে পাওয়া যাবে। পরে দিও আনিয়ে। এবার ধর দেখি বাল্‌বটা, ছেড়ে দেব?

অরুণা কৃত্রিম শঙ্কায় বলল, না, না, এত উঁচু থেকে ধরতে পারব না।

মৃদু হেসে বীরেন দু-তিন ধাপ নিচে নেমে এল, বলল, এখন পারবে তো?

পাছে এতেও না পারে, নিচু হয়ে বাল্‌বটা অরুণার হাতের মধ্যে গুঁজে দিল বীরেন। বাল্‌বে কারেন্ট ছিল না, তবু সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎপ্রবাহ বয়ে গেল অরুণার।

দুপুর বেলায় মেঝেয় ফুলতোলা আসন পেতে ঠাঁই করে মিনতি বড় একখানা ভাতের থালা এনে সামনে ধরে দিল। দু'তিন রকমের ডাল তরকারি, ইলিশ মাছের ঝোল, টক। শেষে দই আর দুটো সন্দেশ।

ভিন্ন জাত আর জাত মিস্ত্রীর ছেলে বলে কানাইকে দেওয়া হলো বারান্দায়। ব্যবস্থাটাও একটু ভিন্ন রকমের হোল।

পাতের কাছে সুধাময়ী এসে বসলেন, বললেন, চোখে আর তেমন দেখতে পাই না বাবা। তা ছাড়া বুড়ো বয়সে নানা রকমের রোগ এসে ধরেছে। কিছুই দেখতে শুনতে পারি নে। তোমার খাওয়ার বোধ হয় খুব কষ্ট হোল।

বীরেন খেতে খেতে বলল, হ্যাঁ, আয়োজন বাড়িয়ে বউদি কষ্টই দিয়েছেন। কত পদ যে খাচ্ছি গুণে শেষ করতে পারছি না।

মিনতি বলল, কি যে বলেন, কি এমন করতে পেরেছি।

সুধাময়ী বললেন, দেখ তো মিছেমিছি অফিসটা আমাদের জন্য কামাই করলে। তোমার যতসব অদ্ভুত অদ্ভুত খেয়াল। এ সব মিস্ত্রীদের কাজ তাদের দিয়ে করালেই হোত। তোমার শখের সঙ্গে কি আর পারবার জো আছে।

বীরেন খেয়ে যেতে লাগল। কোন জবাব দিল না।

একটু চুপ করে থেকে সুধাময়ী আবার বললেন, হ্যাঁ বাবা, অফিসে কত করে পাও আজকাল।

বীরেন মাছের একটু কাঁটা চিবিয়ে ফেলে বলল, বলবার মত নয় মাসীমা। শ' দুই টাকাব মত কোন রকমে হয়।

সুধাময়ী বললেন, বাঃ, দু'শো টাকা কম হোল নাকি। আমাদেব শিশির তো এখনো—বলতে বলতে কথাটা চেপে গেলেন সুধাময়ী, তারপর পুত্রবধূর দিকে চেয়ে বললেন, রুণি গেল কোথায়। ওকে ডাক না বউমা, পাখাটা নিয়ে বসুক এসে এখানে। বেচারা গরমে হাঁপিয়ে উঠেছে। কারো যদি কোন আক্কেল থাকে তোমাদের।

অরুণা নিজের ঘরে তক্তপোশের ওপর পা ঝুলিয়ে চুপ কবে বসেছিল, মিনতি এসে বলল, যাও ঠাকুরঝি, ও-ঘরে ডাক পড়েছে তোমার। পাখা নিয়ে বাতাস করগে, যাও।

অরুণা বলল, আমাকে আবার কেন। তোমরাই তো আছ।

মিনতি জবাব দিল, ও, আমরা আছি বলেই বুঝি তুমি যেতে পারছ না?

খাওয়া দাওয়ার পর ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম করে ফের কাজ শুরু করল বীরেন। ফুট-ফরমাশ খাটতে কানাই বার বার বাইরে যেতে লাগল। আর তার জায়গায় জোগান দেওয়ার জন্য বার বার ডাক পড়ল অরুণার। অরুণা কৃত্রিম বিরক্তিতে ভ্রু কুঞ্চিত করে বলল, ভালো মুশকিল। দিনভর কি আপনার সাকরেদী করব। আমার নিজেব কোন কাজকর্ম নেই বুঝি?

বীরেন হেসে বলল, ও, তোমার নিজের কাজ? গা-ধোয়া আর চুল বাঁধা তো? তার জন্য ঠিক সময়ে ছুটি দেব। ভেব না।

অরুণা বলল, অমন যদি করেন, তাহলে আমি আর ডাকলেও আসব না।

কিন্তু বিকালের দিকে চুল বেঁধে চাঁপা ফুলের রঙের শাড়ি পরে না ডাকতেই এল অরুণা। এসে জিজ্ঞাসা করল তারপর মিস্ত্রী সাহেব, আজ সন্ধ্যায় আলো জ্বলবে তো?

একটা দিনের ঘনিষ্ঠতায় দাদার বন্ধু কখন যে তার নিজের বন্ধু হয়ে উঠেছে নিজেও টের পায় নি। বীরেনও জবাব দিল, সন্ধ্যা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে কেন। আলো তো আমার সামনে এখনই জ্বলে উঠেছে।

ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে লজ্জায় একটুকাল চুপ করে রইল অরুণা, তারপর যেতে যেতে বলল, ঈশ, আপনি যদি আলো জ্বালাতে পারেন আমি বা কি বলছি।

বীরেন মৃদুস্বরে বললে, আগুন জ্বালাতে কিন্তু এখনই পেরেছি।

[illegible] গেল না। তার পরদিনও অফিস কা[illegible] বাসায় এসে মিস্ত্রীগিরি করতে এল বীরেন। অফিসে বেরুবার [illegible] আজও বন্ধুকে [illegible] করে গেল শিশির —[illegible] যা লোক, মিস্ত্রীটিটি [illegible] কাউকে ডেকে আনলেই [illegible] পাঁচ দশ টাকা নিতই

কিন্তু [illegible] মধ্যে প্রশ্রয়ের সুর মিশে রইল পনের আনা।

তারপর দিনভর বীরেন বাড়ির ঘরে ঘরে নতুন তার বসাল, গুলি বসাল, সুইস বসাল, টেস্ট বাল্‌বে পরীক্ষা করে নিয়ে বাল্‌বগুলি ফিট্‌ করে দিল। শিশিরের ঘরে একটা টেবিল ল্যাম্প করে দিল বীরেন, আর অরুণার ঘরে বাড়তি একটা নীল রঙের বেড সুইচ। টিপবার সঙ্গে-সঙ্গেই সমস্ত ঘর আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

বীরেন হেসে বলল, কেমন খুশী তো? অরুণা হাসিমুখে চুপ করে রইল।

বীরেন বলল, এবার আমার পুরস্কার। অরুণা হেসে বলল, পুরস্কার? দাঁড়ান সার্টিফিকেট লিখে দিচ্ছি, আপনি জাতমিস্ত্রীর চেয়েও সেরা। কাগজ-কলম নিয়ে সত্যিই কি যেন লিখতে যাচ্ছিল অরুণা,

বীরেন সেটা কেড়ে নিতে নিতে বলল, থাক, থাক সার্টিফিকেট তোমাকে আর লিখতে হবে না।

কাগজটুকু সুদ্ধু নরম মুঠিটুকু একটুকাল নিজের হাতের মধ্যে চেপে ধরল বীরেন। মুঠি তো নয়, যেন একমুঠো ফুল। অরুণা সঙ্গে সঙ্গেই অবশ্য হাতখানা ছাড়িয়ে নিল না। রুদ্ধশ্বাসে চুপ করে রইল।

তারপর বাইরে জুতোর শব্দ শোনা যেতেই চকিত হয়ে হাত ছাড়িয়ে নিল অরুণা, মৃদুস্বরে বলল, ছাড়ুন, দাদা আসছে।

দেখেশুনে শিশিরও খুব খুশী হোল। একে একে সমস্ত সুইচ অন করে দিল শিশির। সারা বাড়িটা ঝলমল করে উঠল আলোয়। শিশির তাকিয়ে দেখল বাড়ির চেয়েও যেন বেশি ঝলমল করছে অরুণার মুখ।

নৈশ ভোজের পর বন্ধুকে বাসে তুলে দিয়ে এল শিশির, বলল, আবার কবে আসছ ?

বীরেন জবাব দিতে না দিতে বাস ছেড়ে দিল।

দিন তিনেক পর সিনেমার একটা পাস নিয়ে এল শিশির। বক্‌সে চারজনের পাশ। সপরিবারে দেখবার ব্যবস্থা আছে। সাহিত্যিক বন্ধুর বই, যিনি তুলেছেন সেই পরিচালকও শিশিরের বন্ধু। তাঁদের যৌথ সৌজন্যে একেবারে বক্‌সের পাস মিলেছে। ছেলে-মেয়েদের মা'র জিম্মায় রেখে স্ত্রী আর বোনকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল শিশির। বলল, চল বীরেনকে এই সঙ্গে ধরে আনা যাক। মিনতি হেসে বলল, সেই ভালো। তিনিও ধরা দেওয়ার অপেক্ষায় আছেন। আমি ভেবেছিলাম সামনের রবিবার তাঁকে খেতে বলব। তারপর মা বলবেন অন্য সব কথা। তার আগেই তুমি পাশ নিয়ে এলে।

শিশির বলল, মন্দ কি ? কিন্তু বীরেনের ঠিকানা ? আমি তো জিজ্ঞাসা করে রাখি নি।

মিনতি বলল, ঠিকানার জন্য ভাবনা কি। ঠিকানা ঠিক লোকের

কাছে আছে। ঠাকুরঝি, বল দেখি। আমাকে কেবল বাগবাজারের কথা বলেছিলেন গলির নাম আর নম্বরটা কি যেন।

অরুণা লজ্জিত ভঙ্গিতে বলল, নম্বর জানিনে। অনেকবার জিজ্ঞাসা করতে করতে গলির নাম একবার বলেছিলেন, কাঁটাপুকুর লেন।

শিশির অসন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বলল, আচ্ছা মানুষ তোরা। পুরো ঠিকানাটা টুকে রাখবি তা নয়। যাক্, ওতেই হবে। গলিতে ঢুকে নাম আর চেহারার বর্ণনা দিলে নিশ্চয়ই খুঁজে বের করা শক্ত হবে না, চল।

দু'বার বাস বদল করে বাগবাজারের মোড়ে নেমে তিনজনে খানিকটা পথ হেঁটে গিয়ে উপস্থিত হোল কাঁটাপুকুর লেনে। যাকে সামনে দেখল তাকেই জিজ্ঞাসা করতে লাগল শিশির, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ভারত ইন্‌সিওরেন্সে কাজ করেন। চেনেন? এই গলিতেই থাকেন তিনি। বাড়ির নম্বরটা বলতে পারেন কেউ আপনারা?

কেউ পারে না।

চেহারা টেহারার বর্ণনা দেওয়ায় চোয়াল ভাঙ্গা, ঘাড় চাঁচা বকাটে ধরনের একটি ছেলে হঠাৎ বলে উঠল, ও, বীরুদাকে খুঁজছেন। ওই বস্তির ভিতরে থাকেন তিনি।

স্যাঁৎসেঁতে মেটে বস্তি। দিনের আলো সেখানে ঢোকে না। রাত্রির দীপ এখনও জ্বালা হয় নি। একটি তালাবন্ধ ঘরের দিকে ছেলেটি আঙ্গুল বাড়িয়ে দিল, ওই ঘরে থাকেন, বোধ হয় কাজে টাজে কোথাও বেরিয়েছেন।

শিশির বলল, আজ আবার কাজ কোথায়। আজ তো পাবলিক হলিডে।

অরুণা বলল, অসম্ভব, এসব জায়গায় তিনি থাকতেই পারেন না।

বস্তিবাড়ি থেকে বেরিয়ে সবাই ফের পথে নেমেছে, কানাইয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। একটা স্ক্রু ড্রাইভার নিয়ে সে উত্তরের দিকে ছুটতে ছুটতে যাচ্ছে।

অরুণাই থামাল তাকে, আরে শোন, শোন, বীরেনবাবু থাকেন কোথায় জানো? তার বাসা কোথায়?

কানাই থেমে দাঁড়িয়ে সবাইকে একবার দেখে নিয়ে বলল, বাসা? বাসায় তো তাঁকে পাবেন না। সতের নম্বরের বাড়িতে কাজ করছেন যে বীরুদা। আসুন আমার সঙ্গে।

অরুণা বলল, কাজ করছে? কি কাজ?

কি কাজ, সেটা অবশ্য দু'মিনিটের মধ্যে স্বচক্ষেই দেখতে পেল সবাই। সতেব নম্বরের বাড়ির একেবারে সামনের বৈঠকখানা ঘরেই দেয়ালে মই ঠেকিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে একটি হোল্ডারের ভিতবে বাল্‌ব বসিয়ে দিচ্ছে বীবেন। গায়ে ময়লা একটা গেঞ্জি। ঘাম চুইয়ে পড়ছে কপাল দিয়ে।

বাড়ির প্রৌঢ় কর্তা হুঁকোয় তামাক খাচ্ছিলেন, শিশিবদের দিকে একটুকাল অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে বললেন, আপনারা?

শিশিরদের হয়ে কানাই জবাব দিল, আজ্ঞে, ওঁরা মিস্ত্রীমশাইর কাছে এসেছেন। বাসায় না পেয়ে—

কুঞ্জবাবু একটু হেসে বললেন, ও, আপনাদেবও লাইট বিগড়েছে বুঝি? কিন্তু আজ তো ওকে ছাড়তে পাবব না, কালও না। ও বীরু মিস্ত্রী, দেখ, কা'বা খুঁজতে এসেছেন তোমাকে।

বীরেন সামনেব দিকে একবাব তাকিয়ে মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে পিছন ফিরে ফেব নিজের কাজে মন দিল।

কুঞ্জবাবু জিজ্ঞাসা কবলেন, আজ অন্তত গোটা দুই বাল্‌ব জ্বলবে তো মিস্ত্রী?

বীরেনের জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে, কোন কথা না বলে শিশির মিনতি আর অরুণা তিনজন ফের রাস্তায় নামল।

দু'দিকের বাড়িগুলিতে তখন বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলে উঠছে।